মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR
রেজি: নং- ১৪৫ বর্ষ-২, সংখ্যা-৪

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

মে ২০১৩ইং, জুমাদাল উখরা ১৪৩৪হি:, বৈশাখ ১৪২০বাং

جمادى الاخرى ١٤٣٤هـ مايو ٢٠١٣م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)
প্রধান সম্পাদক
মুফতী আরশাদ রহমানী
সম্পাদক
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক
নির্বাহী সম্পাদক
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
মুহাম্মদ হাশেম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
মাও: নাসির উদ্দীন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা
মুফতী জামাল উদ্দীন
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী
মুফতী মাহমূদুল হক্ব
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী
মুফতী জা'ফর আলম কাসেমী

বিনিময়: ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে ৫
পবিত্র সুন্নাহ থেকে ৬
দরসে ফিকহ ৮
মুফতী শাহেদ রহমানী
হযরত হারদূয়ী (রহ.) এর অমূল্য বাণী ১০
মাওয়ায়েযে ফক্বীহুল মিল্লাত ১১
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ-১০ ..... ১৬
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব
মদীনা সনদ ২০
মাও: মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
কোয়ান্টাম মেথড-১৩..... ২৭
মুফতী শরীফুল আজম
হযরত তালহা (রা.) ৩৩
আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৩৬
নবীজী (সা.) যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন-৭ ৪১
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
নারী অধিকার : ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ৪৩
হাফেজ রিদওয়ানুল কাদের উখিয়াভী
উদীয়মান কাফেলা ৪৭

যোগাযোগ
সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত স্মরণী, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন: ০২৮৪০২০৯১,০২৮৮৪৫১৩৮
ইমেইল :monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক:০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮১২৩৫৭৫২২
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯ সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৮৩১৭৪০৫৪০

সম্পাদকীয়

কওমী মাদরাসা : আদর্শ ও উদ্দেশ্য

কওমী মাদরাসা একটি আদর্শ, একটি সফলকাম শিক্ষা পদ্ধতি। সঠিক দ্বীনি শিক্ষা ও বাস্তব অনুশীলনের একটি কামিয়াব সোপান। বাংলাদেশসহ পুরো দুনিয়াতেই হাজার হাজার কওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত হচ্ছে। এর সূচনা ছিল অতি ছোট্ট পরিসরে। কিন্তু এর ক্রমবিস্তৃতি ও ব্যাপক সফলতা সকলের জন্য রীতিমত ঈর্ষণীয়।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল মুসলমানদের পক্ষ থেকে ভারত উপমহাদেশকে বৃটিশ আগ্রাসন মুক্ত করার সর্বশেষ সশস্ত্র পদক্ষেপ। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শক্তি এতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, মুসলিম জাতি কোন অবস্থাতেই গোলামীর জিন্দেগী বরণ কোনোভাবেই মেনে নেবে না। তাই তারা কর্ম কৌশল পরিবর্তন করেছিল। এক দিকে উপমহাদেশের লক্ষ মুসলমানের বুকের তাজা রক্তে খুনের দরিয়া রচনা করল, অপর দিকে তারাই আবার সর্বসাধারনের কল্যাণকামীর মুখোশ পরে তাদের সামনে হাজির হল। উদ্দেশ্য ছিল, ভয়-ভীতি দেখিয়ে কিংবা গায়ের জোরে যে কওমকে দমন করা যায় না, ধীরে ধীরে তাদের চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতায় আমূল পরিবর্তন আনা। যেন তারা ধর্মীয় অনুশাসন, স্বকীয় সভ্যতা ও দীপ্তিমান অতীতকে ভুলে গিয়ে অদূর ভবিষ্যতে নিজেকে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে আবিস্কা করতে না পারে।

এই হীন উদ্দেশ্য সফল করার সবচেয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ ছিল মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা। এর মাধ্যমে তাদের দিল-দেমাগে পাশ্চাত্যের চতুর্মূখী প্রভাব বদ্ধমূল করা। যেন এতে প্রভাবিত হয়ে তারা নিজ বিবেক দিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি দূর্বল হয়ে পড়ে। এ লক্ষকে সামনে রেখে 'লর্ড ম্যাকল' এদেশের মানুষের জন্য এক নতুন শিক্ষানীতির সুপারিশ করেন। তা বাস্তবায়নের লক্ষে তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। তাতে ভারতবর্ষের জাতীয় শিক্ষানীতি তথা মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ন্যাক্কারজনক ভাবে উপহাস করা হয় এবং ওলামায়ে কেরামের উপর ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। পরিশেষে তিনি স্পষ্ট ভাষায় লেখেন– " এখন আমাদের কর্তব্য হল, এমন একদল লোক তৈরি করা যারা আমাদের অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসী ও আমাদের মাঝে দোভাষীর দায়িত্ব পালন করবে। যারা রক্ত ও বর্ণে হিন্দুস্তানী হলেও চিন্তা-চেতনা, মেধা-মনন ও চারিত্রিক দৃষ্টিকোন থেকে হবে ইংরেজ"।

তৎকালীন দূরদর্শী ওলামায়ে কেরাম এই সুদূর প্রসারী চক্রান্ত ও তার ভয়াবহতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, এমতাবস্থায় মুসলমানদের দ্বীন-ঈমান রক্ষার্থে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ না নিলে অদূর ভবিষ্যতে তারা স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে না। কয়েক খান্দান পর হয়তো ইসলাম ও তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে সচেতন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই তাঁরাও সম্মুখ সমরে লড়াই পরিহার করতঃ কার্যপদ্ধতিতে পরিবর্তন আনয়নে সচেষ্ট হলেন।

তারও আগে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের শাসনামলে শুধুমাত্র দিল্লিতেই সহস্রাধিক মাদরাসা ছিল। কিন্তু বৃটিশ আগ্রাসনের পর পুরো ভারতবর্ষে একটি মাদরাসা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। ওলামায়ে কেরামকে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণের অপরাধে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হত কিংবা আন্দামান দ্বীপে নির্বাসন দেয়া হত। আর যারা মুক্ত ছিলেন, সংঘবদ্ধ হওয়া তাদের জন্য ছিল দুষ্কর। তাই আকাবির ওলামাগণ একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্জন গ্রামকেই বেছে নিয়ে কওমী মাদরাসার এই ধারা সূচনা করেন।

১৫ মুহাররম ১২৮৩ হিজরী মোতাবেক ৩০শে মে ১৮৬৬ ঈসায়ী নিতান্ত অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানে কোন প্রচার মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াই দেওবন্দের ছোট্ট পল্লিতে, ছাত্তা মসজিদের আঙ্গিনায়, একটি ডালিম গাছের ছায়ায় বর্তমান দারুল উলূম দেওবন্দের যাত্রা আরম্ভ হয়। এই বীজ বপনে অংশ নেন মূলত হযরত আল্লামা কাসেম নানুতবী (রহ.), হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গুঙ্গুহী (রহ.) এবং হাজী আবেদ হুসাইন (রহ.)। দুই বুযুর্গের মাধ্যমে কার্যত প্রতিষ্ঠানটির পদযাত্রা শুরু হয়। প্রথমজন শিক্ষক; হযরত মাওলানা মোল্লা মাহমুদ। দ্বিতীয়জন ছাত্র; দেওবন্দের কিশোর মাহমুদ হাসান। যিনি পরবর্তীতে শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান নামে

খ্যাত হন এবং ইংরেজ খেদাও আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

লর্ড ম্যাকল কর্তৃক ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার হীন ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতঃ দ্বীনকে সঠিকভাবে অক্ষুন্ন রাখা ছিল দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য। এরই সাথে ওলামায়ে কেরামের এমন এক মুখলিস জামাত তৈরি করাও ছিল সময়ের দাবী, যে কোন পরিস্থিতিতে যারা দ্বীনকে আগলে রাখবেন এবং সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবেন। যেন সাধারণ মানুষ ইসলামের হেদায়েত অনুসারে জীবন যাপন ও তার আলোকে নিজ ভবিষ্যত গড়তে পারে।

তাকওয়া ও ইখলাসের ভিত্তিতে ছোট্ট পরিসরে প্রতিষ্ঠিত ছাত্তা মসজিদের আঙ্গিনায় গড়ে উঠা প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারিত রূপই আজকের সারা দুনিয়ায় বিস্তৃত কওমী মাদরাসা।

কওমী মাদরাসা তার সূচনা লগ্ন থেকেই তালীম তারবিয়্যাত, তাযকীয়া-তাসাউফ, দাওয়াত-সিয়াসতসহ প্রতিটি অঙ্গনের জন্য জন্ম দিয়ে এসেছে যুগের খ্যাতনামা মনীষীবর্গ। যারা দ্বীনকে আগলে রেখেছেন অক্ষুন্ন আদলে। তার অমিয় বাণী পৌছে দিয়ে যাচ্ছেন উম্মাহর প্রতিটি ব্যক্তির কানে। আহারে-অনাহারে, দুঃখে-সাচ্ছন্দ্যে যে কোন প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে, আপন স্বার্থকে পেছনে ফেলে উম্মতের মাঝে ধর্মীয় মূল্যবোধ টিকিয়ে রাখতে তারা নিবেদিত প্রাণ। বাতিলের শত ঝড় ঝাপটার মুখে হিমালয়ের মত অবিচল ধর্মদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় উত্তাল নববী আদর্শের মূর্তপ্রতিক।

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই এ শিক্ষা ধারার উদ্দেশ্য ছিল নিরক্ষরতা দূরীকরণ, ধর্মীয় শিক্ষার বিস্তার, জান্নাতমুখী জনগোষ্ঠী তৈরীকরণ, সামাজিক কুসংস্কার ও কুপমন্ডুকতা দূরিকরণ ও ব্যক্তি চরিত্র সংশোধন। প্রচলিত ও দলীয় রাজনীতির প্রভাব বলয় থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে কওমী মাদরাসার পরিচালক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ পবিত্র কুরআন, হাদীস, ফিক্হ, ভাষা-সাহিত্য, ক্লাসিক্যাল দর্শনের শিক্ষা ও খিদমত সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়ে আসছেন শত বছর ধরে। বাংলাদেশের বিগত ৪৩ বছরের ইতিহাসে কওমী মাদরাসার শিক্ষার্থীদের রাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী কোন কর্মকান্ডে বা সন্ত্রাসী কোন তৎপরতার সাথে জড়িত থাকার কোন প্রমাণ নেই। কওমী মাদরাসা শিক্ষার সুদীর্ঘ ইতিহাসে খুন-খারাবী, হল দখল, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসের ন্যুনতম কোন নজির নেই। এসব মাদরাসায় রাজনীতিভিত্তিক কোন ছাত্রসংসদ নেই এবং ছাত্রদের দলীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততাও নিষিদ্ধ। ফলে এখানে বিরাজ করে রাজনীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সুষ্ঠু শিক্ষার শান্ত পরিবেশ।

কওমী মাদরাসাসমূহ পরিচালিত হয় মূলত দেশের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অর্থায়নে। এদেশের কোটি কোটি জনগণের সাথে কওমী মাদরাসার প্রাণের সম্পর্ক বিদ্যমান। কওমী মাদরাসা থেকে পাশ করা ছাত্ররা দেশে বিদেশে তথা ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের সরকারী-বেসরকারী পদে, মসজিদ, মাদরাসা পরিচালনা, দাওয়াত-তাবলীগ, সমাজ সংস্কার, নিরক্ষরতা দূরিকরণ এবং সঠিক দ্বীনি শিক্ষা বিস্তারে গৌরবোজ্জ্বল অবদান রেখে চলেছেন। কওমী মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকরা ঈমানী চেতনা, মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ ও দেশপ্রেমের আদর্শে প্রবলভাবে উজ্জীবিত। দাওয়াতী মেযাজ সবার মধ্যে কমবেশী ক্রিয়াশীল।

বর্তমান স্যাকুলার সমাজ যারা ইসলামকে দুনিয়া থেকে বিদায় দিতে মরিয়া (নাউজু বিল্লাহ) তাদের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ এই কওমী মাদরাসা। তাদের মানসিকতা হলো সঠিক ইসলামী শিক্ষা বিলীন না হলে ইসলামের জয়জয়কার রুখা যাবে না। এ কারণে সঠিক ও শুদ্ধ ইসলাম যারাই শিক্ষা দিবে তাদের যেভাবেই হোক ঘায়েল করতে হবে। প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে গনমানুষকে তাদের প্রতি সন্দিহান করে তোলতে হবে। বিভিন্ন কুৎসা রটিয়ে তাদের প্রতি মুসলমানদের অকপট ভালবাসায় চিড় ধরাতে হবে। তাদের সঠিক ও সফল ইসলামী শিক্ষার স্থলে স্যাকুলার বা পার্থিব অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের শিক্ষাক্রমে প্রবিষ্ট করতে হবে। কিংবা তাদের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী আদর্শ থেকে বিচ্যুত করে সচরাচর স্যাকুলার আদর্শে গড়ে তোলতে হবে। এ রূপ প্রভূত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ভিন্ন ভিন্নভাবে কাজে লাগানো হয়েছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে।

তাদের কেউ কেউ সবসময় কওমী মাদরাসা এবং আলেম উলামার বিরুদ্ধে বিষোদগারে লিপ্ত। তাদের হেয়প্রতিপন্ন করার যাবতীয় অপচেষ্টার কিছুই বাকী রাখা হচ্ছে না। অপর দিকে কাজে লাগানো হয়েছে মুখোশধারী কিছু কিছু ইসলামিক স্কলারকে। যারা শুধুই কওমী মাদরাসাসমূহের ছেঁদান্বেষণ এবং তার সমাধান প্রচার করে থাকেন। কেউ কেউ ব্যস্ত থাকেন কওমী আলেম ওলামা এবং ছাত্র-শিক্ষককে কিভাবে তাদের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত করা যায় তার ফিকিরে। সাথে রাখা হয়েছে বিভিন্ন

মিডিয়াকে। যারা কওমী মাদরাসার নামে বিভিন্ন মিথ্যা উদ্ভট বানোয়াট চিত্র উপস্থাপন করে গনমানুষের মাঝে কওমী মাদরাসার প্রতি ঘৃণা সঞ্চারে ব্যস্ত।

মূলত : কওমী মাদরাসার মিশন তিনটি। সঠিক দ্বীনি তালীম, তারবিয়্যাত এবং দাওয়াত। এই তিন মিশন যদিও ভিন্ন ভিন্নভাবেই চলছে সারা দুনিয়ায় কিন্তু এই তিন মিশনের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। বর্তমানে এই তিন মিশনকে আলাদা করে দেখানো এবং পরস্পরের মধ্যে দ্বান্দ্বিক অবস্থান সৃষ্টির জন্যও ব্যাপক আয়োজন চলছে। তাও কওমী মাদরাসা বিরোধী ষড়যন্ত্রের একটি অংশ।

সম্প্রতি কওমী মাদরাসার বিভিন্ন বিষয় ও পাঠ্যক্রম সম্পর্কে দীর্ঘ একটি প্রতিবেদন ছাপা হয় বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায়। প্রতিবেদনের শেষের দিকে উক্ত প্রতিবেদক লেখেন, "দুর্ভাগ্য যে বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসা নিয়ে বিশেষ গবেষণা হয়নি। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গরিব এলাকাগুলোতে কেন এই মাদরাসা গড়ে ওঠে এবং বাংলাদেশের গরিব মজলুম মানুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ধরণটা আসলে কী সে বিষয়ে অর্থনৈতিক বা সামাজিক গবেষণা না-ই বললেই চলে। কওমী মাদরাসাকে 'আধুনিক' করবার তাগিদই বেশি, যাতে শিক্ষা সম্পর্কে তার বৈপ্লবিক দিক আড়াল করে বিদ্যমান ব্যবস্থার অধীনে এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে অধীনস্থ করা সম্ভব হয়। সেপ্টেম্বর এগারোয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে হামলার পর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে অনন্তযুদ্ধ শুরু হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সেই সময়ের মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কন্ডোলিসা রাইস পাকিস্তানের কওমী মাদরাসাগুলোকে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের টার্গেট বানিয়ে ছিলেন। কওমি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্বেগ ও ঘৃণার প্রধান উৎস এখানেই নিহিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই নতুন যুদ্ধনীতি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ইকোনমিক টাইমস তাদের অনলাইন একটি লেখায় বলছে, মার্কিনিরা সামরিক ঘাঁটি থেকে যুদ্ধ পরিচালনাকে এখন সম্প্রসারিত করেছে কওমী মাদরাসার ওপর। তাদের বিশেষ লক্ষ্য কওমী মাদরাসার কারিকুলাম বা পাঠ্যসূচি। মাদরাসায় যা পড়ানো হয় তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বদলে দিতে চায়।

বাংলাদেশের আলেমওলামারা কওমী মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার চান না তা নয়। চান। প্রয়োজনে নানান সময়ে সংস্কার হয়েছে। সেটা হয়েছে ইসলামি তালিম সম্পর্কে তাদের ধারণা ও আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রেখে। কিন্তু 'আধুনিক' বা 'যুগোপযোগী করার নামে মাদরাসার পাঠ্যক্রম বদলে দেওয়া এবং কওমী মাদরাসার আদর্শের পরিপন্থি শিক্ষাসূচি চাপিয়ে দেওয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মার্কিন যুদ্ধনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচি বদলে দেবার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি ভূমিকা রাখতে চায় সেটাও কন্ডোলিসা রাইস রীতমতো ঘোষণা করেই জানিয়েছেন। তাঁর বয়ান হচ্ছে, "যে নৈরাশ্য থেকে সন্ত্রাসবাদের জন্ম হয় সেই সন্ত্রাস টেকে না যদি জগতে আশার সঞ্চার করা যায়। সেই আশার সঞ্চার করতেই মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম বদলাতে হবে। সেই কারণে মাদ্রাসার ছাত্রদের কেবল করে খাওয়ার ব্যবহারিক জ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে।" কন্ডোলিসার দাবি হচ্ছে, কওমি মাদ্রাসার ছাত্ররা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ঘৃণা করতে শেখে। ব্যবহারিক বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা দরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তারা যেন আর ঘৃণা না করে। 'ঘৃণা শিক্ষা'র পরিবর্তে তাদের শেখানো হবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা, বিভিন্নক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন। যেন তারা পুঁজিবাদের গোলাম হয়ে যায় সাম্রাজ্যবাদের সেবা করে যেতে পারে।" (দৈনিক ইনকিলাব ২৬ এপ্রিল ২০১৩)

এমনিভাবে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে বর্তমান কওমী মাদরাসাসমূহ।

এসব ভয়াবহ অবস্থার প্রেক্ষিতে কওমী মাদরাসার কর্ণধারদের নতুন করে চিন্তা করার সময় এসেছে। তাদের চিন্তা করতে হবে একমাত্র আকাবেরদের আদর্শ, সামগ্রিকভাবে দেওবন্দী চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ হক্কানী ওলামায়েকেরাম ছাড়া কারো হাতেই কওমী মাদরাসা নিরাপদ নয়। সুতরাং কওমী মাদরাসার ক্ষমতায়ন, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা এবং যে কোনো কর্মসূচী বাস্তবায়নে পুরোপুরি আকাবিরদের নীতি-আদর্শের প্রতিফলন থাকতে হবে। ছাত্রদের তারবিয়াতের বিষয়ে কোনো প্রকার উদাসীনতাকে স্থান দেওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে কওমী মাদরাসায় শিক্ষার যে মান তারবিয়্যাতেরও একই মান। তারবিয়াতী দিকটি উপেক্ষিত থেকে গেলে অন্যান্য শিক্ষা ধারার ও কওমী মাদরাসার মধ্যে তফাত অনেকটাই কমে যাবে। তখন কওমী মাদরাসার মূল উদ্দেশ্যই ব্যহত হবে। তাই এ দিকটির প্রতিও কওমী মাদরাসার কর্ণধারদের বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন।

আরশাদ রহমানী
২৯-০৪-২০১৩

পবিত্র কালামুল্লাহ্ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا (الأحزاب٢٦)

الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم لايتقون-فإما تثقفنهم فى الحرب فشردبهم من خلفهم لعلهم يذكرون (الأنفال:٥٦-٥٧)

"আর আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা (বনী কোরায়যা) সম্মিলিত কাফের হানাদার বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল আল্লাহ তা'আলা তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেন। ফলে তোমরা তাদের এক দলকে হত্যা করেছিলে আর এক দলকে বন্দি করেছিলে।" (আহযাব-২৬)

"হে রাসূল! আপনি যাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, তারা প্রত্যেকবারই নিজেদের কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। তারা এর পরিণামকে ভয় করে না। অতএব, যদি আপনি তাদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে পান, তবে এমন শিক্ষা দান করুন, যা দেখে তাদের উস্কানীদাতারাও পলায়নে বাধ্য হয়, যেন তারা দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা পায়।" (আনফাল-৫৬-৫৭)

প্রসঙ্গ কথা :

চলমান বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ থেকে আরম্ভ করে, রাজপথ ও সাধারণ শ্রেণী পর্যন্ত সর্বমহলেই একটি বিষয়ে অপ্রতুল কৌতূহল লক্ষ করা যাচ্ছে। সবাই জানতে চায়, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনী কোরায়যার লোকদের কেন হত্যা করেছিলেন! কী রয়েছে এর পেছনে? কী এর আসল রহস্য? পত্রপত্রিকায় এ বিষয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। তাই উপরোক্ত আয়াতের আলোকে এ বিষয়ে আংশিক আলোকপাতের প্রয়াস পাবো।

বনী কোরায়যার লোকদের চক্রান্তের স্বরূপ :

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় হিজরতের পর মুসলমানদের প্রতিপক্ষ শত্রু হিসেবে দুটি দল প্রকাশ পায়

এক. মক্কার কাফির হানাদার বাহিনী। অপরটি হলো, মদীনায় অবস্থানরত ইয়াহুদী সম্প্রদায়। মদীনার ইয়াহুদী সম্প্রদায় মুসলমানদের প্রতিবেশী হিসেবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করেন। এছাড়া বাহিরের শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা এবং তাদের সহজে মোকাবিলার জন্য ভেতরের শত্রুদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করা একটি কার্যকরী পদক্ষেপ ও অন্যতম কৌশলও বটে।

হাফেয ইবনে কাসীর (রহ.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ "আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে" এ চুক্তিপত্রের শর্তগুলো বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। এতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি ছিল, মদীনার ইয়াহুদীরা মুসলমানদের শত্রুদেরকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো সহযোগিতা করতে পারবে না।

কিন্তু বনী কোরায়যা গোত্রের ইয়াহুদী সম্প্রদায় উল্লেখিত চুক্তি বার বার ভঙ্গ করেছে। আংশিক বিবরণ নিম্নরূপ :

ক. বদরযুদ্ধের সময় মক্কার হানাদার কাফের বাহিনীকে বনী কোরায়যার লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করে। পরে মুসলমানদের বৃহৎ সফলতা ও ঐতিহাসিক বিজয় লক্ষ্য করে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে তারা সকাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করে। দয়ার নবী, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের কথায় বিশ্বস্ত হয়ে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা করেন।

খ. উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় লক্ষ্য করে তাদের দৌরাত্ম্য আরো বেড়ে যায়। তাই ইয়াহুদীদের নেতা কা'ব বিন আশরাফ মক্কায় গিয়ে শত্রুদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতির প্রতি উৎসাহিত করে এবং এই অভিযানে ইয়াহুদীদের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করে। এমর্মে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেন,

والذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم لايتقون-

"তারা সেই সকল লোক যাদের থেকে আপনি অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তারা প্রতিবার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। তারা এর পরিণাম সম্পর্কে ভয় করে না।" (আনফাল-৫৬)

গ. খন্দক যুদ্ধকালে মুসলমানগণ মদীনার বাহিরে কয়েক দিন যাবৎ মক্কার হানাদার বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করছিলেন। আর তখন বনী কোরায়যা নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের উস্কানিতে তারা মদীনায় মুসলমান শিশু ও নারীদের ওপর আক্রমণের ব্যর্থ ষড়যন্ত্র চালায়। তাদের এসব চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের শেষ সমাধান ও চূড়ান্ত শাস্তি হিসেবে আল্লাহ পাক নির্দেশ প্রদান করে বলেন-

وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا-

"আর আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা (বনী কোরায়যা) সম্মিলিত কাফের হানাদার বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতা-সহযোগিতা করেছিল, আল্লাহ তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেন। ফলে তোমরা তাদের এক দলকে হত্যা করেছিলে আর এক দলকে বন্দি করেছিলে।" (আহযাব-২৬)

অপর আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন-

وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم

"আর তাদের ভূমি, ঘরবাড়ি ও মাল সম্পদ তোমাদের আয়ত্বাধীন করে দেন" (আহযাব-২৭)

(বাকি অংশ ৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পবিত্র সুন্নাহ থেকে

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

অহংকার ও জুলুম : হাদীসে কুদসীর আলোকে

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ -رضى الله عنهما -قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الْعِزُّ إِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ .

হযরত আবু সায়িদ খুদরি ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন "ইজ্জত তাঁর লুঙ্গি ও অহংকার তাঁর চাদর, অতএব যে আমার সাথে টানাহেঁচড়া করবে আমি তাকে শাস্তি দিব"। (মুসলিম, ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদ)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى -أَنَّهُ قَالَ : يَا عِبَادِي !إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي ! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي ! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي !كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي !إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي !إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي !لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي !لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي !لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي !إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ .

قَالَ سَعِيدٌ :وَكَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

হযরত আবু যর (রা.) বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: "হে আমার বান্দাগণ! নিশ্চয় আমি আমার ওপর জুলুম হারাম করেছি, আমি তোমাদের মাঝেও তা হারাম করেছি অতএব তোমরা যুলম কর না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই গোমরাহ তবে আমি যাকে হিদায়েত দেই, অতএব আমার কাছে হিদায়েত তলব কর আমি তোমাদেরকে হিদায়েত দিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলে ক্ষুধার্ত তবে আমি যাকে খাদ্য দেই, অতএব আমার নিকট খাদ্য তলব কর আমি তোমাদেরকে খাদ্য দিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলে বিবস্ত্র তবে আমি যাকে বস্ত্র দান করি, অতএব আমার নিকট বস্ত্র তালাশ কর আমি তোমাদেরকে বস্ত্র দিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাত ও দিনে ভুল কর, আমি তোমাদের সকল পাপ মোচন করি, অতএব আমার নিকট ক্ষমা চাও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার ক্ষতি পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না যে আমার ক্ষতি করবে। আর না তোমরা আমার উপকার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে যে আমার উপকার করবে। যদি তোমাদের পূর্বপুরুষ ও পরবর্তী পুরুষ এবং মানুষ ও জিন সকলে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নেককার ব্যক্তির মত হয়ে যাও, তাও আমার রাজত্ব সামান্য বৃদ্ধি করবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্বপুরুষ ও পরবর্তী পুরুষ এবং মানুষ ও জিন সকলে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লোকের মত হয়ে যাও, তাও আমার রাজত্ব সামান্য হ্রাস করবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্বপুরুষ ও পরবর্তী পুরুষ এবং মানুষ ও জিন এক ময়দানে দাঁড়িয়ে আমার নিকট প্রার্থনা করে, অতঃপর আমি প্রত্যেককে তার প্রার্থিত বস্তু প্রদান করি, তাও আমার নিকট যা রয়েছে তা হ্রাস করতে পারবে না, এ পরিমাণও সুই যে পরিমাণ পানি হ্রাস করে যখন তা সমুদ্রে প্রবেশ করানো হয়। হে আমার বান্দাগণ! এ তো তোমাদের আমল যা আমি তোমাদের জন্য সংরক্ষণ করি, অতঃপর তোমাদের তা পূর্ণ করে দেব। অতএব যে ভাল কিছু পেল সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে, যে অন্য কিছু পেল সে যেন নিজেকে ভিন্ন কাউকে দোষারোপ না করে"। (মুসলিম, তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ)

আবু সায়িদ বলেন: আবু ইদরিস খাউলানি যখন এ হাদিস বলতেন: হাঁটু গেড়ে বসতেন।

عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -رضى الله عنهما -قَالَ :بَلَغَنِي حَدِيثٌ عَنْ رَجُلٍ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاشْتَرَيْتُ بَعِيرًا ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَيْهِ رَحْلِي ,فَسِرْتُ إِلَيْهِ شَهْرًا حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْهِ الشَّامَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ.

فَقُلْتُ لِلْبَوَّابِ :قُلْ لَهُ :جَابِرٌ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ :ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ؟ قُلْتُ :نَعَمْ .فَخَرَجَ يَطَأُ ثَوْبَهُ فَاعْتَنَقَنِي وَاعْتَنَقْتُهُ فَقُلْتُ :حَدِيثًا بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقِصَاصِ فَخَشِيتُ أَنْ تَمُوتَ أَوْ أَمُوتَ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعَهُ, قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -أَوْ قَالَ :الْعِبَادُ -عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا، قَالَ :قُلْنَا: وَمَا بُهْمًا؟ قَالَ :لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ ثُمَّ يُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ

مِنْ قُرْبٍ :أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّانُ ,وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَقٌّ حَتَّى أُقِصَّهُ مِنْهُ ,وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَلِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقٌّ حَتَّى أُقِصَّهُ مِنْهُ حَتَّى اللَّطْمَةُ، قَالَ: قُلْنَا :كَيْفَ وَإِنَّا إِنَّمَا نَأْتِي اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ -عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا؟ قَالَ :بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ

১৪২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার নিকট একটি হাদিসের সংবাদ পৌঁছেছে, যা কোন এক ব্যক্তির নিকট রয়েছে যে তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছ থেকে শুনেছে। অতঃপর আমি একটি উট খরিদ করি ও তাতে সফর করি, অতঃপর একমাস সফর করে শামে গিয়ে তার সাক্ষাত লাভ করি, দেখলাম তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস।

আমি দারোয়ানকে বললাম: তাকে বল: জাবের দরজায় অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন: (জাবের) ইবনে আব্দুল্লাহ? আমি বললাম: হ্যাঁ, তিনি নিজ কাপড় হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বের হলেন, অতঃপর আমার সাথে আলিঙ্গন করলেন, আমিও তার সাথে আলিঙ্গন করলাম। আমি বললাম: আপনার কাছ থেকে আমার নিকট কিসাস সম্পর্কে একটি হাদিস পৌঁছেছে যে, আপনি তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট শ্রবণ করেছেন, আমি আশঙ্কা করছিলাম, হয় আপনি মারা যাবেন, অথবা আমিই মারা যাব তা শ্রবণ করার আগে। তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি: "কিয়ামতের দিন মানুষদের অথবা বলেছেন: বান্দাদের, হাজির করা হবে, (উরাত) উলঙ্গ, (গুরলান) খৎনা বিহীন, (বুহমান) রিক্ত হস্তে"। তিনি বলেন: আমরা বললাম: বুহমান কি? তিনি বললেন: "তাদের সাথে কিছু থাকবে না। অতঃপর তিনি তাদেরকে নির্দিষ্ট আওয়াজ দ্বারা ডাক দিবেন যা নিকট থেকে শুনা যাবে: আমিই বাদশাহ, আমি প্রতিদান দানকারী, কোন জাহান্নামী যার কোন জান্নাতির নিকট হক রয়েছে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না আমি তার থেকে তাকে কিসাস পাইয়ে দিব। কোন জান্নাতি যার নিকট কোন জাহান্নামীর হক রয়েছে জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না আমি তার থেকে তাকে কিসাস পাইয়ে দিব, এমনকি চড় পর্যন্ত"। তিনি বলেন: আমরা বললাম: কিভাবে তা সম্ভব হবে, আমরা তো তখন আল্লাহর নিকট উলঙ্গ, গুরলান বুহমান হাজির হব? তিনি বললেন: নেকি ও পাপের মাধ্যমে"। (আহমদ, বুখারি ফিল আদাবিল মুফরাদ, আবু আসেম, হাকেম)

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

বনী কোরায়যার শাস্তির প্রক্রিয়া :

উপরোক্ত আয়াতের মর্মানুসারে তাদেরকে তিন প্রকার শাস্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় :

ক. তাদের ৬০০/৭০০ প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষকে হযরত আলী (রা.) ও যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

খ. তাদের মহিলা ও শিশুদেরকে দাস হিসেবে মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করা হয়।

গ. তাদের মাল-সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারীদের শাস্তি :

উপরোক্ত ঘটনার সারমর্ম হিসেবে তাফসীর গ্রন্থসমূহে যা পাওয়া যায়, বস্তুত বনী কোরায়যা সম্প্রদায় মুসলমানদের চির শত্রু মক্কার হানাদার কাফের বাহিনীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছে। সহযোগিতা করেছে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে। তারা নিজেরাও মদীনায় মুসলমান নারী শিশুদের ওপর আক্রমণের ষড়যন্ত্রে ছিল। এক কথায় হানাদার বাহিনীর সঙ্গে একাকার হয়ে তারা মুসলমানদের হত্যা করার ষড়যন্ত্রে নেমেছিল। এমনকি, বলতে গেলে তারা পরোক্ষভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উপনীত হয়েছিল। আর এ ধরনের কর্মের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি একমাত্র মৃত্যুদণ্ড। তাই কুরআনে কারীম এ সিদ্ধান্তই ব্যক্ত করেছে। আল্লাহ তা'আলা অপর আয়াতে বলেন,

فإما تثقفنهم في الحرب فشردبهم من خلفهم لعلهم يذكرون

"যদি তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পান তবে এমন শিক্ষা দিন, যা থেকে তাদের পরবর্তীরাও পলায়নে বাধ্য হয় এবং দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা নেয়।" (আনফাল-৫৭)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), সাঈদ ইবনে যুবাইর (রহ.) ও জাহহাক (রহ.) প্রমুখ মুফাসসিরগণ উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এতে বনী কোরায়যার লোকদেরকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

অপব্যাখ্য ও ভুল প্রচারণা কেন?

উপরোক্ত আয়াতসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় যে, বনী কোরায়যার লোকদেরকে রাজনৈতিক কোনো কারণে হত্যা করা হয়নি। হত্যা করা হয়নি মদীনাকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়ার কারণে। বরং মুসলমানগণকে হত্যার দূরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার কারণেই তাদেরকে হত্যার শাস্তি পেতে হয়েছে। ভোগ করতে হয়েছে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে হানাদার বাহিনী কাফেরদের সহযোগিতা করার পরিণাম।

সূত্র : তাফসীরে কুরতুবী ৮-২১,নূরুল কুরআন ১০/৪৩-৪৪, রুহুল মা'আনী ৫/২১৮, ইবনে কাসীর ৩/২৭৮

দরসে ফিক্বহ

শরীয়তের আলোকে ক্রেডিট কার্ড

মুফতী শাহেদ রহমানী

পৃথিবীতে কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন সব ক্ষেত্রে প্রত্যেকে পণ্যের মুখাপেক্ষী। প্রয়োজন পূরণে দারস্থ হতে হয় অন্যের নিকট। অপরের কাছ থেকে নিজের প্রয়োজন মেটাতে দরকার পড়ে বিনিময় মাধ্যমের। তাই আদিযুগ থেকে মানুষ বিভিন্ন বস্তুকে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বিনিময় মাধ্যম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন স্বর্ণ, রুপাকে। পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে বিনিময় মাধ্যমের পরিবর্তন ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে মানবসমাজে। নিকট-অতীতে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় বিভিন্ন প্রকারের পেপার নোট বা কাগুজে মুদ্রা। ইতোমধ্যে তার পরিবর্তন হতে শুরু করেছেন বিভিন্ন প্রকারের কার্ডের দ্বারা। ব্যাপক হারে মানুষ ব্যবহার করছে বিভিন্ন প্রকারের কার্ড। এ ধরনের মৌলিক কিছু কার্ডের শরয়ী বিধানের আলোচনা নিয়ে আজকের দরসে ফিকহ।

বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে কার্ড তিন প্রকার : ১. ডেবিট কার্ড ২. চার্জ কার্ড ৩. ক্রেডিট কার্ড।

ডেবিট কার্ড :

এই কার্ড ব্যবহারকারীর পূর্ব থেকেই ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলা থাকে। উক্ত অ্যাকাউন্টে বিদ্যমান টাকা দ্বারা কার্ড ব্যবহার করে ক্রয়কৃত পণ্য/সেবার মূল্য পরিশোধ করে। উপরোক্ত সংজ্ঞায় এ কথা স্পষ্ট যে, ডেবিট কার্ডের ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টে বিদ্যমান টাকার প্রতি লক্ষ রাখা হয়। বিনিময় মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে আদায়কৃত টাকা তার অ্যাকাউন্ট থেকে তাৎক্ষণিক কর্তন করা হয়। এই কার্ড দ্বারা ধার, কর্জ বা ঋণ গ্রহণের কোনো সুযোগ থাকে না। কোথাও এই কার্ড ইস্যু করার জন্য ফি নেওয়া হয়, কোথাও নেওয়া হয় না।

নিম্নোক্ত সুবিধাদির ভিত্তিতে এই কার্ড ইস্যু করা হয় –

১. এই কার্ড শুধুমাত্র ব্যাংকে বিদ্যমান অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের নামেই ইস্যু করা হয়।

২. এই কার্ড দ্বারা কার্ড হোল্ডারের অ্যাকাউন্ট ব্যতীত নগদ টাকা উত্তোলন করা যায় না।

৩। এর ব্যবহারে কোনো ফি লাগে না।

৪। কার্ড হোল্ডার ব্যাংক থেকে টাকা গ্রহণ বা কার্ড দ্বারা পণ্য/সেবা ক্রয় করার পর ব্যাংকে তার বিল পৌঁছার সাথে সাথে তার অ্যাকাউন্ট থেকে সে পরিমাণ টাকা কর্তন হয়ে যায়।

৫। নিজ দেশে ব্যবহারযোগ্য তবে কোনো কোনো সময় দেশের বাইরেও ব্যবহার করা যায়।

৬। কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক ছাড়া অন্য ব্যাংকের মেশিন থেকেও টাকা উত্তোলন করা যায় তবে সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যাংক ইস্যুয়ার ব্যাংক থেকে ফি গ্রহণ করে থাকে, যা কার্ড ব্যাবহারকারীকে বহন করতে হয়।

ডেবিট কার্ড ব্যবহারের শরয়ী হুকুম :

উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এ কার্ড দ্বারা টাকা উত্তোলন, পণ্য/সেবা ক্রয়ের বিনিময় পরিশোধ সবই তার অ্যাকাউন্টে বিদ্যমান টাকা দ্বারাই করা হয়, যা অনেকটা ব্যাংকের চেক প্রদানের মতোই। তাই শরীয়ত মতে এ কার্ড দ্বারা টাকা উত্তোলন পণ্যক্রয় ও যাবতীয় লেনদেন সম্পূর্ণ বৈধ। তবে শরীয়ত পরিপন্থী সেবা, পণ্য ক্রয় সর্বাবস্থায় হারাম।

চার্জ কার্ড :

এ কার্ড ব্যবহারকারীর জন্য ব্যাংক থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ গ্রহণের সুযোগ দিয়ে থাকে। নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে উক্ত ঋণ পরিশোধ করে দিলে এর বিনিময়ে কোনো সুদ আদায় করতে হয় না। অন্যথায় তাকে সুদ আদায় করতে হয়।

নিম্নোক্ত সুবিধাদির ভিত্তিতে এই কার্ড ইস্যু করা হয় :

১। এ কার্ড দ্বারা পণ্য ক্রয়, সেবা গ্রহণ, নগদ টাকা উত্তোলন করা যায়। যার সর্বোচ্চ পরিমাণ, পরিশোধের মেয়াদ নির্দষ্ট থাকে। কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ থাকে না।

২। এ কার্ড দ্বারা অন্যান্য কার্ডের মতো ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র পণ্য ক্রয় সেবা গ্রহণ করে বিল পরিশোধ করা যায় সীমিত সময়ের জন্য। মোদ্দাকথা, এ কার্ড ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের একটি মাধ্যম মাত্র।

৩। কার্ড হোল্ডার নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করে দিলে কোনো প্রকার সুদ দিতে হয় না।

৪। কার্ড হোল্ডার ক্রয়কৃত পণ্যের ওপর কোনো কমিশন দিতে হয় না।

৫। কার্ড ইস্যুয়ার কার্ড হোল্ডার কর্তৃক ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে।
৬। কার্ড হোল্ডারকে কার্ড গ্রহণের ফি ও বাৎসরিক নবায়ন ফি আদায় করতে হয়।

চার্জ কার্ডের শরয়ী হুকুম :

শরীয়তের দৃষ্টিতে এ কার্ড ব্যবহার সম্পূর্ণ হারাম। কারণ এ কার্ডের লেনদেনের সাথে সুদ সংযুক্ত। তবে নিম্নোক্ত শর্তের সাথে তা ব্যবহার করা যেতে পারে।

১। কার্ড হোল্ডার নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যেই ঋণ পরিশোধ করে দিবে যাতে কোনো অবস্থাতেই সুদ দিতে না হয়।
২। কার্ড হোল্ডার উক্ত কার্ড কোনো অনৈসলামিক ও অনৈতিক কাজে ব্যবহার করতে পারবে না।
৩। ডেবিট কার্ড দ্বারা প্রয়োজন পূরণ করা গেলে চার্জ কার্ড ব্যবহার করবে না।

ক্রেডিট কার্ড :

এ কার্ড দ্বারা সুদভিত্তিক ঋণ প্রদান এবং ঋণ পরিশোধ করা হয়। এর ব্যবহারকারী নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয় করে। কার্ডের বাহক ঋণ পরিশোধে কিস্তির সুবিধা পেয়ে থাকে ও ঋণের ওপর ব্যাংক সুদ নিয়ে থাকে। এ ধরনের কার্ডই বর্তমান সব চেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে।

১। এ কার্ড সুদের ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের একটি মাধ্যম।
২। কার্ড হোল্ডার ক্রয়কৃত পণ্য/সেবা গ্রহণের পর ব্যাংক থেকে কার্ড দ্বারা প্রাপ্ত ঋণের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করে।
৩। কার্ডের বাহককে নির্দিষ্ট করে দেওয়া মেয়াদে আদায় না করলে সময় বৃদ্ধির সাথে সুদও চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে যায়।
৪। ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট বিদ্যমান নেই এমন ব্যক্তির নামেও এ কার্ড ইস্যু করা হয় কোনো কোনো সময়। কিছু কিছু ব্যাংক এ কার্ড ইস্যু করার জন্য বাৎসরিক ফি নিয়ে থাকে। অনেকে নেয় না।

ক্রেডিট কার্ডের শরয়ী হুকুম :

এ কার্ডের চুক্তিটি মূলত সুদি ঋণেরই হয়ে থাকে। তাই এটির ব্যবহার শরীয়ত মতে সম্পূর্ণ হারাম। যদিও কোনো কোনো ব্যাংক এ সুবিধা দিয়ে থাকে যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করলে সুদ দিতে হয় না। তবুও মূল চুক্তিটি যেহেতু সুদভিত্তিক ঋণের তাই এটির ব্যবহার কোনোভাবেই বৈধ নয়।

এটিএম কার্ড :

এ কার্ড মেশিনের সাহায্যে টাকা উত্তোলনের কাজে ব্যবহৃত হয়। এ কাজটি ডেবিট এবং ক্রেডিট কার্ডের দ্বারাও হয়ে থাকে।

একার্ডের শরয়ী হুকুম হলো, ইস্যুকারী ব্যাংক যদি টাকার অনুপাতে চার্জ নিয়ে থাকে তাহলে এর ব্যবহার বৈধ নয়। তবে মেশিন ব্যবহার ও কার্ডসংক্রান্ত অন্যান্য সার্ভিসের জন্য নির্দিষ্ট হারে চার্জ নিতে পারবে।

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী

১. হযরত (রহ.) বলেন, দুটি বস্তু একই ধরনের হলে এর একটিকে অন্যটির ওপর প্রাধান্য দেওয়া যুক্তিসংগত নয়। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি প্রশ্ন করে চক্ষু ভালো নাকি কান ভালো? তখন কি উত্তর দেওয়া হবে। প্রত্যেক অঙ্গই তো জরুরি। এসব অঙ্গের মধ্যে উত্তম-অনুত্তমের প্রশ্ন করাই ভুল। কেননা, প্রত্যেকটির কার্যকারিতা ভিন্ন ভিন্ন। তবে দুই চক্ষুর মধ্যে যে চক্ষু দিয়ে তুলনামূলক বেশি দেখা যায় সেটাকে উত্তম বলা যায়। অনুরূপ দুই কানের মধ্যে যে কান দিয়ে ভালো শোনা যায়, সেটাকে উত্তম বলা যায়।

তা'লিম-শিক্ষা, তাবলীগ-দ্বীনের প্রচার-প্রসার করা, তাযকিয়া-আত্মশুদ্ধি বা আত্মার সংশোধন করা। এ তিনটির মধ্যে কোনটি প্রয়োজন বেশি এ প্রশ্ন অযৌক্তিক। কেননা, এ বিষয়গুলো ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ের হওয়ায় একটির ওপর অপরটিকে প্রাধান্য দেওয়া যায় না। তাই প্রত্যেকটির প্রয়োজন আছে। তবে تزكية نفس তথা আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ফলাফলের দিক থেকে তালিম এবং তাবলীগ থেকে বেশি। অর্থাৎ তালিম ও তাবলীগের সাথে তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব দেওয়া বেশি জরুরি। কেননা তালিম আমল ও তাবলীগ তাযকিয়া ছাড়া পরিপূর্ণ হয় না।

তাযকিয়ার মারকায হলো আল্লাহ ওয়ালাদের খানকা। তাযকিয়ায়ে নাফসের দ্বারা অন্তরে ইখলাস সৃষ্টি হয়, আর ইখলাস ছাড়া সমস্ত আমল ইবাদত অহেতুক হয়ে যায়। যেমন রিয়া (লোক দেখানো) সম্পর্কীয় হাদীসে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিবসে সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তির ব্যাপারে জাহান্নামের ফয়সালা হবে। এবং জাহান্নামের সর্বপ্রথম ওই তিন ব্যক্তিকে নিক্ষেপ করা হবে। এদের মধ্যে একজন হবে দ্বীন এবং কুরআনের আলেম, যিনি সারা জীবন কুরআন শিক্ষা ও শেখানোর মধ্যে অতিবাহিত করেছে। দ্বিতীয় হবে একজন সম্পদশালী দানশীল ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ পাক অঢেল সম্পদের মালিক বানিয়েছেন এবং সে পূণ্যের কাজে অনায়াসে খরচ করেছে। তৃতীয় ব্যক্তি হবে একজন শহীদ, যিনি জিহাদের ময়দানে শত্রুর তরবারীতে শহীদ হয়েছে। কিন্তু এ তিন প্রকার ব্যক্তির এসব আমল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য করেনি রবং দুনিয়ার ইজ্জত এবং প্রসিদ্ধি লাভের জন্য করেছে। হুজুর (সা.) বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে যখন এ তিন ব্যক্তি পেশ হবে তখন আল্লাহ পাক বলবেন, আমি তোমাদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে জানি। এসব ভালো কাজ আমার সন্তুষ্টির জন্য কর নাই বরং দুনিয়াতে সুনাম অর্জন ও প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে করেছিলে। আর এসব উদ্দেশ্য দুনিয়াতে তোমাদের পূরণ হয়ে গেছে বিধায় এখানে তোমাদের জন্য কিছুই নেই। এরপর সবাইকে ওই সব আমলের কারণে টেনেহিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করানো হবে। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, এরাই প্রথম জাহান্নামি। এ হাদীসটি যখন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করতেন ভয়ের দরুন কখনো কখনো চিৎকার করে বেহুশ হয়ে পড়তেন একবার এক তাবেঈ এ হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে শুনে হযরত মু'আবীয়া (রা.) কে বর্ণনা করলে তিনি এমনভাবে ক্রন্দন করতে লাগলেন যদ্দরুন আশপাশের লোকদের ভয় হয়ে গেল যে, তার প্রাণ যেন বের হয়ে যাবে। এবং দীর্ঘ সময় পর তিনি স্বাভাবিক হলেন। এবং বললেন, صدق الله ورسوله আল্লাহ ও তার রাসূল সত্যই বলেছেন। من كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها نوف اليهم যাহারা নিজ আমলের মাধ্যমে দুনিয়া এবং দুনিয়ার জাকজমক প্রত্যাশা করবে। তাদের আমলের পরিপূর্ণ ফলাফল দুনিয়াতেই আমি দিয়ে দেব এবং এতে কোনো কমী করা হবে না। তবে তাদের জন্য আখিরাতে জাহান্নামের আগুন ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। এবং তারা যে আমল করেছিল তা বিনষ্ট ও অনর্থক সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

২. হযরত (রহ.) বলেন, যে লাইনে দ্বীনের কাজ করবে অন্য লাইনের মর্যাদা যেন ক্ষুণ্ন করা না হয় যেমন মাদরাসা কর্তৃপক্ষের শুধু নিজের মাদরাসাই লক্ষ্যবস্তু হওয়ার মানসিকতা রাখা যে, শুধু আমাদের মাদরাসা থেকে দ্বীন প্রচার-প্রসার হোক এ মাদরাসাই শুধু উন্নতি করুক এ ধরনের আকাঙ্ক্ষা না করে সমস্ত দ্বীনি মাদরাসার উন্নতির জন্য অন্তর থেকে দু'আ এবং হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া। যদি ব্যক্তিগতভাবে দ্বীনের কাজ করে থাকে তবে এ আকাঙ্ক্ষা না করা যে শুধু আমার মাধ্যমেই দ্বীনের প্রচার-প্রসার হোক বরং অন্যদের দ্বারা দ্বীনের প্রচার হলে তখন তো কোনো সমস্যা বা চিন্তার কারণ নেই। এ ধরনের মানসিকতা নফসের প্ররোচনা ধোঁকা এবং আমিত্বের বহিঃপ্রকাশ। ইখলাসের ভিত্তি তো এটাই যে যার দ্বারাই দ্বীন প্রচার হোক না কেন তাতে খুশি হওয়া এবং তার সহযোগিতা করা। تعاونوا على البروالتقوى পূণ্যের যেকোনো কাজে সহযোগিতার যখন আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেখানে পূণ্যের কাজ সেখানেই সহযোগিতা করবে। প্রত্যেক দ্বীনের খাদেমকে নিজের বন্ধু মনে করবে। প্রতিপক্ষ মনে করবে না। নিজেকে অগ্রাধিকার দেবে না এবং দ্বীনকে অগ্রাধিকার দেবে। যার দ্বারাই দ্বীনের কাজ ভালোভাবে হচ্ছে তাকেই সহযোগিতা করবে।

মাওয়ায়েযে

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

বসুন্ধরা মারকায, চট্টগ্রাম শুলকবহর মাদরাসাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম) আকদ নিকাহ অনুষ্ঠান এবং হাদীসের দরসে বিবাহের শরয়ী নীতিমালা, সুন্নত তরীকা, সমাজে প্রচলিত রুসুম সম্পর্কে বিস্তারিত বয়ান ও তাকরীর পেশ করেন।
তাঁর বয়ানগুলোর আলোকে প্রমাণিক এই প্রবন্ধটি সাজানো হয়েছে।

ইসলামী বিয়ে-৩

প্রকৃত আবেদ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা :
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিবাহ ইবাদতের প্রতিবন্ধক নয়, তবে বিবাহ না করা ইবাদতের প্রতিবন্ধক অবশ্যই। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন-

اعلم: أن المنى إذاكثر تولده فى البدن صعد بخاره إلى الدماغ، فحبب إليه النظر إلى المرأة الجميلة، وشغف قلبه حبها، ونزل قسط منه إلى الفرج، فحصل الشبعق، واشتدت الغلمة، وأكثر مايكون ذلك فى وقت الشباب، وهذا حجاب عظيم من حجب الطبيعة،يمنعه من الامعان فى الاحسان، ويهيجه إلى الزنا،ويفسد عليه الأخلاق، ويوقعه فى مهالك عظيمة من فسادذات البين، فوجب إماطة هذاالحجاب.

অর্থাৎ যখন প্রজনন পদার্থের পরিমাণ শরীরে বেড়ে যায় তখন তার বাষ্প মস্তিস্ককে গ্রাস করে নেয়। ফলশ্রুতিতে সুন্দরী পরনারীর প্রতি দৃষ্টি করা প্রিয় বস্তুতে পরিণত হয়, আর অন্তর হয় ওই নারীর ভালোবাসায় বন্দি। আর বির্যের একটি অংশ প্রজনন অঙ্গের দিকে নেমে আসে। যার ফলে দেহে এক ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং নারীর সংস্পর্শ অর্থাৎ সহবাসের আগ্রহ অনুভূত হয় তীব্রভাবে। এমনটি যৌবনে বেশি হয়ে থাকে। আর এটি মানুষের স্বভাবজাত একটি বড় বাঁধ। যা তাকে নেক কাজে আত্মনিয়োজিত হতে বাধাগ্রস্ত করে, ব্যভিচারের প্রতি করে উৎসাহিত, চরিত্রকে ধ্বংস করে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট করে। অতএব এই বাঁধ দূর করা আবশ্যক।

বাঁধ দূর করতে হবে যেভাবে :
যৌবন পাগলামী উম্মাদনার অপর নাম, এটি মানুষকে ভালো কাজের তুলনায় মন্দের দিকেই বেশি আকৃষ্ট করে। সুতরাং এর লাগাম টেনে ধরে দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার পথ মসৃণ করাই হবে একজন খাঁটি মুমিনের কাজ। এ ক্ষেত্রে খোদাভীরু মুমিনের করণীয় হলো, সামর্থ্য থাকলে বিবাহ করা, অন্যথায় লাগাতার রোজা রাখা। (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে)

বৈরাগ্যবাদ :
অনেকে বেশি বেশি ইবাদত করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য বৈবাহিক জীবন অবলম্বন না করে চিরকুমার-চিরকুমারী থাকার পথ অবলম্বনন করে। যা খ্রিস্টান ধর্মজাযক ও মাদাররা করে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এ পন্থা অবলম্বন করা মারাত্মক ভুল। এ ব্যাপারে শাহ দেহলভী (রহ.) বলেন-

اعلم أنه كانت المانوية والمترهبة من النصارى يتقربون إلى الله بترك النكاح، وهذاباطل، لأن طريقة الأنبياء عليهم السلام التى ارتضاها الله للناس! هى إصلاح الطبيعة ودفع اعوجاجها، لاسلخها عن مقتضيا تها.

অর্থাৎ ইরানের মানী ফেরকার লোকেরা এবং খ্রিস্টান রাহেবরা বিবাহ বর্জন করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চায়, যা একটি ভুল পদ্ধতি। কেননা সমস্ত নবীগণ (আ.)-এর পথ ও পদ্ধতি যা, আল্লাহ তা'আলা পুরো মানবজাতির জন্য পছন্দ করেছেন তা হলো স্বভাবের ইসলাহ-সংশোধন করা এবং তার বক্রতাকে দূর করা। স্বভাবজাত চাহিদাকে সমূলে উৎপাটন করা নয়। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ ৫/২৬)

বৈরাগ্যবাদের সূচনা :
বৈরাগ্যবাদের সূচনা এভাবে হয়েছিল যে, হযরত ঈসা (আ.) কে আসমানে তুলে নেয়ার বহুকাল পরে তাঁর অনুসারীদের ওপর বিভিন্ন রাজা-বাদশারা জুলুম-নির্যাতন চালাতে থাকলে দ্বীন রক্ষার খাতিরে তারা শহর ছেড়ে বন-জঙ্গল, পাহাড়ের গুহা ইত্যাদিতে বসবাস শুরু করে। যেখানে স্বাভাবিক জীবনযাপনের অতি সাধারণ উপকরণ ও সুবিধা পাওয়ার বিষয়টি ছিল কল্পনাতীত। কালক্রমে এই কঠিন পদ্ধতিটিই তাদের কাছে একটি মহান ইবাদত হিসেবে পরিগণিত হয়। পরবর্তীকালের লোকেরা স্বাভাবিক জীবনযাপনের যাবতীয় সরঞ্জামাদি

হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও মনগড়া এই ইবাদতের জন্য তা পরিহার করতে থাকে। উল্লেখ্য যে, প্রথম দিকে তারা এ প্রথা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই অবলম্বন করেছিল। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে এ বিষয়টির স্বীকৃতি দিয়েছেন, ইরশাদ করেন-

ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلاابتغاء رضوان الله.

অর্থাৎ আর বৈরাগ্যবাদের যে বিষয়টা তা তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছিল। আমি তাদের জন্য তা বাধ্যতামূলক করিনি। বস্তুত তারা (এর মাধ্যমে) আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান করতে চেয়েছিল। (তাওযীহুল কুরআন ৩/১৬৯৬)

বিচ্যুতি :

কিন্তু পরবর্তীকালে তারা তাদের উদ্ভাবিত এই প্রথার মূল উদ্দেশ্য পুরোপুরি রক্ষা করতে পারেনি, পদে পদে তাদের বিচ্যুতি ঘটে। এর মূলে দুটি কারণ রয়েছে :

এক. আল্লাহর নির্দেশের অনুবর্তী না থাকা, এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা যে জিনিস বাধ্যতামূলক করেননি, সেটাকে নিজেদের জন্য বাধ্যতামূলক করে নেয়া। দ্বীনের মাঝে নিজের পক্ষ থেকে কোনো জিনিস জরুরি মনে করা সম্পূর্ণ নাজায়েয।

দুই. প্রবর্তিত প্রথাকে যথাযথভাবে পালন না করা। কারণ রহবানিয়্যাতের ব্যবস্থাটাই ছিল সম্পূর্ণভাবে মানব স্বভাবের পরিপন্থী, যে কারণে মানব-প্রকৃতির সাথে তার সংঘাত ছিল একটি অনিবার্য বাস্তবতা, হলোও তাই, ধীরে ধীরে এক সময় মানব প্রকৃতির কাছে এই প্রথা হার মানতে বাধ্য হলো। যেমন, প্রবর্তিত রহবানিয়্যাতে বিবাহ ছিল একটি নিষিদ্ধ জিনিস। যে কারণে রাহেবরা তাদের আদর্শ বিচ্যুত হয়ে যৌন সম্ভোগের জন্য ব্যভিচারের মতো জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হতে থাকে এবং তাদের গির্জাগুলোতে তা মহামারির আকার ধারণ করে। ফলে যে উদ্দেশ্যে তাদের রহবানিয়্যাতের প্রবর্তন তা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যায়। (আসান তরজমায়ে কুরআন ৩/১৬৯৬)

এর একটি জ্বলন্ত প্রমাণ, বিশ্বজুড়ে প্রচারমাধ্যমগুলোতে আলোচিত একটি ঘটনা, তা হলো ক্যাথলিক ধর্মযাজক পোপ ষোড়শ বেনিডিক্টের স্বপদ থেকে পদত্যাগ করা। যার নজির বিগত হাজার বছরের খ্রিস্টান ইতিহাসে বিরল। সংবাদমাধ্যমগুলোর রিপোর্ট অনুযায়ী এর মূল কারণ হলো, খ্রিস্টান পাদ্রিদের অতিমাত্রায় যৌন কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতির মতো অপরাধে জড়িয়ে যাওয়া। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাদের খিয়ানতের ব্যাপারে কুরআনে ঘোষণা করেন। فمارعوها حق رعايتها অর্থাৎ কিন্তু তারা তা (প্রবর্তিত সন্ন্যাসবাদ) যথাযথ পালন করেনি। (সুরা হাদীদ, আয়াত ২৭)

ইসলাম বনাম বৈরাগ্যবাদ :

ইসলাম শুরুলগ্ন থেকেই বৈরাগ্যবাদের বিরোধী, স্বভাব পরিপন্থী মানব প্রবর্তিত একটি প্রথা হওয়ার কারণে। বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার জন্য নিম্নে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হলো।

১. হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ردرسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل، ولوأذن له لا ختصينا.

অর্থাৎ উসমান ইবনে মাযউন (রা.) স্ত্রীবিহীন জীবন যাপন করার অনুমতি প্রার্থনা করলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা প্রত্যাখ্যান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত উসমানকে অবিবাহিত জীবন যাপন করার অনুমতি প্রদান করতেন তাহলে আমরা আল্লাহর ইবাদতে এমনভাবে মনোনিবেশ করতাম যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমাদেরকে খাসি/নপুংশক মনে হতো। (বুখারী হা.৫০৭৩, মুসলিম হা.১৪৫২)

২. অন্য এক বর্ণনায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكنى أصوم وافطر وأصلى وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منى.

অর্থাৎ শোনো! আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আল্লাহর ডর-ভয় তোমাদের চেয়ে আমার বেশি, তবুও আমি নফল রোজা কখনো রাখি কখনো রাখি না। রাতের কিছু অংশ নফল ইবাদতে কাটাই আর কিছু অংশে ঘুমাই এবং বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত (বিবাহ করা) হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার অনুসারী নয়। (বুখারী হা. ৫০৬৩)

৩. অন্যত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

لاصرورة فى الاسلام অর্থাৎ "ইসলামে সন্ন্যাসবাদের কোনো স্থান নেই।" (আবু দাউদ হা.১৭৩০)

৪. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আক্কাফ ইবনে ওয়াদা'আ নামক একজন সাহাবীকে সম্বোধন করে বলেন,

هل لك زوجة؟ قال: لا قال: ولاجارية قال: لا، قال: وأنت موسر قال: وأنا موسر قال: أنت إذامن اخوان الشياطين، إن سنتنا النكاح شراركم عزابكم وفى رواية: وانت صحيح موسر قال نعم، قال فأنت إذا من إخوان الشياطين، إن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم، وإن كنت منا فسنتنا النكاح والذى نفسى بيده! مالشياطين سلاح أبلغ وقال بعضهم:

أنفذ فى الصالحين من الرجال والنساء من ترك النكاح.

অর্থাৎ "তোমার কি স্ত্রী আছে?, তিনি বলেন, না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, দাসীও নেই? তিনি বলেন– না, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, অথচ তুমি সামর্থ্যবান! তিনি বলেন, হ্যাঁ, অথচ আমি সামর্থ্যবান। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তাহলে তো তুমি শয়তানের ভাই! আমার সুন্নাত হলো বিবাহ করা। তোমাদের অবিবাহিতরা তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট। (মুসনাদে আহমদ ৫/১৬৩)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, অথচ তুমি সুস্থ-সবল? তিনি বলেন, হ্যাঁ। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাহলে তো তুমি শয়তানের ভাই! তুমি খ্রিস্টান পাদ্রীদের অনুসারী হলে তাদের সঙ্গে যোগ দাও! আর যদি আমার অনুসারী হও তাহলে জেনে রেখো, আমার সুন্নাত হলো বিবাহ করা। ওই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন! নেককার নর-নারীকে বিপদগামী করার জন্য শয়তানের সব চেয়ে কার্যকরী অব্যর্থ অস্ত্র হলো তাদের অবিবাহিত থাকা। (মুসনাদে আহমদ হা.নং ২১৫০৬)

৫. হযরত আবু উমামা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

تزوجوا فإنى مكاثربكم الأمم ولاتكونوا كرهبانية النصارى.

অর্থাৎ তোমরা বিবাহ করো। কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের ওপর গৌরব করব। তোমরা খ্রিস্টান পাদ্রীদের ন্যায় অবিবাহিত জীবন যাপন করো না। (বায়হাকী হা.৫৪৮৫)

কঠোর হুঁশিয়ারির মূল রহস্য :

প্রশ্ন জাগতে পারে যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেন সন্ন্যাসবাদের তীব্র নিন্দা এবং এ ব্যাপারে উম্মতকে সাবধান করে এত কঠোর হুঁশিয়ারি ব্যক্ত করলেন? এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.) বলেন, দৈহিক চাহিদাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

১. তীব্র চাহিদা।

২. মুতলক (সাধারণ) চাহিদা।

মুতলক চাহিদা যেহেতু স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য তাই তা কোনোভাবেই দূর করা যাবে না। মুজাহাদাহ, দাওয়া-ই'লাজ যতই করা হোক মুতলক চাহিদার অস্তিত্ব মানব স্বভাবে থেকেই যাবে। আমি তো সত্তর (৭০) বছরের এক বৃদ্ধকে দেখেছি, একজন বালকের প্রতি তার ছিল অগাধ ভালোবাসা। অথচ তার মধ্যে কোনো কিছু করার মতো শক্তি-সামর্থ্য ছিল না। তবে তাকে দেখার চাহিদা ছিল, আর এটা কামুক দৃষ্টিতে হতো, যা নিঃসন্দেহে হারাম।

মোটকথা হলো, মুজাহাদার দ্বারা মুতলক চাহিদা দূর হয়ে যাবে এমনটি হতে পারে না, বার্ধক্য, ঔষধপত্র এবং খাওয়া-দাওয়ার পরিমাণ হ্রাস কোনো কিছুর দ্বারাই হবে না। মুজাহাদার উপকারিতা শুধু এতটুকু যে, চাহিদার তীব্রতা হ্রাস পাবে মাত্র। পূর্বে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা ছিল দুষ্কর, মুজাহাদার পর তা হবে সহজতর। শেষ কথা হলো, চাহিদা একেবারে দূর হয়ে গেলে সওয়াব পাবে কিভাবে। মনের চাহিদার মুকাবেলা করে নেক কাজে অটল থাকলেই তো মানুষ সওয়াবের অধিকারী হতে পারে।" (হুকুকুয যাওজাইন ১৫৮, ইসলামী শাদী ৩৩)

একটি প্রবাদ বাক্য আছে, "মানুষ বুড়ো হলে ও তার মন বুড়ো হয় না" অর্থাৎ কর্মক্ষমতা হারালেও মনের চাহিদা শেষ হয় না। বরং প্রতিনিয়ত তা বাড়তেই থাকে। যেমন হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে,

لايزال قلب الكبير شابا فى اثنين فى حب الدنيا وطول الأمل.

অর্থাৎ দুটি বিষয়ে বৃদ্ধের অন্তর প্রতিনিয়ত চাঙ্গা হতে থাকে : ১. দুনিয়ার প্রীতি ২. এবং দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা। (বুখারী হা. ৬৪২০, মুসলিম হা.নং ১০৪৬)

ভোগের উপকরণ :

হাদীস শরীফে দুনিয়ার প্রীতি দ্বারা পার্থিব ভোগ-বিলাসের উপকরণকে বোঝানো হয়েছে। শরয়ী নীতিমালা ও সীমারেখার ভেতরে থেকে দুনিয়া ভোগ করা নিন্দনীয় নয়। বরং ঈর্ষণীয়। ভোগ সামগ্রীর একটি তালিকা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কুরআনে প্রদান করেন, ইরশাদ করেন,

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث، ذلك متاع الحيوة الدنيا والله عنده حسن الماب.

অর্থাৎ মানুষের জন্য ওই সকল বস্তুর আসক্তিকে মনোরম করা হয়েছে, যা তার প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী হয় অর্থাৎ নারী, সন্তান, রাশীকৃত সোনা-রুপা, চিহ্নিত অশ্বরাজি, চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত-খামার। এসব ইহজগতের ভোগ সামগ্রী। কিন্তু স্থায়ী পরিণামের সৌন্দর্য কেবল আল্লাহরই কাছে।"

সর্বোত্তম ভোগ-সামগ্রী :

ভোগ সামগ্রীর ফিরিস্তিতে নারীর স্থান শীর্ষে। তবে শীর্ষস্থানের উপযোগী হওয়া এবং তা ধরে রাখার জন্য তার গুণগত মান থাকা ও জরুরি, যা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক

হাদীসে নির্ণয় করে দেন। ইরশাদ করেন,

الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.

অর্থাৎ দুনিয়ার সব কিছুই ভোগবিলাসের সামগ্রী। তবে সর্বোত্তম ভোগের জিনিস হল নেককার স্ত্রী। (মুসলিম হা. ১৪৬৭ এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আগামীতে উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।)

অবিবাহিত বস্ত্রহীন :

আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবস্থা করেছেন দুটি উদ্দেশ্যে ১. লজ্জা স্থান ঢেকে রাখা এবং ২. সৌন্দর্য অবলম্বন করার জন্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন يبنى ادم قد انزلنا عليكم لباسا يورى سواتكم وريشا অর্থাৎ হে আদমের সন্তানসন্ততি! আমি তোমাদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছি, তোমাদের দেহের যে অংশ প্রকাশ করা দূষণীয় তা ঢাকার জন্য এবং তা সৌন্দর্যেরও উপকরণ।" (সুরা আ'রাফ আয়াত ২৬)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীর একজনকে অন্যজনের পোশাক হিসেবে আখ্যায়িত করেন, ইরশাদ করেন- هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. অর্থাৎ তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরাও তাদের জন্য পোশাক।" (সুরা বাকারা ১৮৭)

এবার ভেবে দেখুন, আল্লাহ তা'আলা স্বামী স্ত্রীকে পোশাকের সাথে তুলনা করেছেন। যেমন বস্ত্রহীন থাকা নির্লজ্জতা দূষণীয়, নয়তো অসৌন্দর্যের প্রতীক, তেমনি অবিবাহিত থাকা দূষণীয় এবং অসুন্দর জীবনযাপনের পদ্ধতি বেছে নেয়ার শামিল।

অবিবাহিত সর্বহারা :

যুবসমাজের মাঝে বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষিতদের মাঝে একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, "আগে নিজের পায়ে দাঁড়াও তারপর বিয়ে করো" বাগধারাটি কতটুকু যথার্থ এ বিষয়ে আলোচনা সামনে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ। তবে এখানে এতটুকু উল্লেখ করতেই হয় যে, এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং হাদীসের পরিপন্থী একটি উক্তি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

مسكين مسكين مسكين رجل ليس له امرأة وإن كا ن كثير المال، مسكينة مسكينة مسكينة إمرأة ليس لها زوج وإن كانت كثيرة المال.

অর্থাৎ যে পুরুষের স্ত্রী নেই সে বাহ্যিক অঢেল সম্পদের অধিকারী হলেও বাস্তবে সে অসহায়, অসহায়, অসহায়! তেমনি যে নারীর স্বামী নেই বাহ্যিকভাবে সে যতই প্রাচুর্যের মালিক হোক প্রকৃত পক্ষে সে সর্বহারা, সর্বহারা, সর্বহারা। (মাজমাউল বাহরাইন, হা.২২৩৮)

বিবাহ না করার উজর :

শরীয়তসম্মত কোনো কারণে কেউ বিবাহ না করলে তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যাবে না এবং এমন ব্যক্তি হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন ধমকের আওতায় ও পরবে না। মৌলিকভাবে উজরকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় যথা :

এক. স্ত্রীর দৈহিক চাহিদা পূরণে অক্ষমতা।

দুই. স্ত্রীর ভরণপোষণে অক্ষমতা।

তিন. দ্বীনি উজর। যেমন;

১. স্ত্রীর অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে দ্বীনি কোনো বিধান ছুটে গেলে, যথা : ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ছুটে যাওয়ার নিশ্চিত আশঙ্কা থাকলে বা কোনো প্রকারের হারামে লিপ্ত হওয়ার ভয় হলে যেমন, হারাম পন্থায় উপার্জন।

২. দ্বীনি ব্যস্ততার কারণে স্ত্রীর অধিকার রক্ষা করা সম্ভব না হলে।

এ মর্মে দুটি হাদীস নিম্নে পেশ করা হলো,

১. হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) এবং আবু হুরাইরা (রা.) সূত্রে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

يأتى على الناس زمان، لايسلم لذى دين دينه إلامن فرمن شاهق، إلى شاهق أومن جحر إلى جحر، كالثعلب بأشباله وذلك فى آخر الزمان إذالم تنل المعيشةإلا بمعصية الله، فإذا كان كذلك حلت العزبة ، يكون فى ذلك الزمان هلاك الرجل على يدى أبويه إن كان له أبوان، فإن لم يكن له أبوان، فعلى يدى زوجته وولده،فإن لم تكن له زوجة ولا ولد،فعلى يدى الأقارب والجيران، يعيرونه بضيق المعيشة، ويكلفونه ما لا يطيق، حتى يورد نفسه الموارد التى يهلك فيها.

অর্থাৎ একটি সময় আসবে যখন দ্বীনদারের জন্য তার দ্বীন রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তবে যে ব্যক্তি নিজের দ্বীন রক্ষার্থে পাহাড়ের এক চূড়া থেকে অন্য চূড়ায় বা এক গুহা থেকে অন্য গুহায় স্থানান্তর হতে থাকে। (তখনই তার পক্ষে দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হবে) যেমন; শিয়াল তার শাবকদের জীবন রক্ষার্থে তাদের নিয়ে ঘন ঘন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাড়ি জমাতে থাকে। এমনটি শেষ যমানায় হবে। যখন হারাম পন্থা ছাড়া অর্থ উপার্জন সম্ভব হবে না। যখন পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে তখন অবিবাহিত জীবন যাপন করা বৈধ হবে। সে যুগে কারো পিতা-মাতা থাকলে তার ধ্বংস তাদের হাতে হবে। পিতা-মাতা না থাকলে তার ধ্বংস তার স্ত্রী ও সন্তানদের হাতে হবে। স্ত্রী ও সন্তান না থাকলে তার ধ্বংস তার আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীর হাতে হবে। আর্থিক সংকটের কারণে তারা

তাকে তিরস্কার করবে এবং আর্থিক সামর্থ্যের বাহিরে কোনো কাজ করতে বাধ্য করবে। শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে ধ্বংস ক্ষেত্রে উপণীত করবে। (অর্থাৎ হারাম পন্থায় উপার্জনে লিপ্ত হবে) (কানযুল উম্মাল হা. ৩২০০৮, হুলইয়াতুল আউলিয়া ১/২৫, আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ২/৫৮১ হা.৪৮৬১)

২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন,

أتى رجل بإبنته إلى رسول الله ﷺ فقال: إن ابنتى هذه أبت أن تتزوج، فقال لها رسول الله ﷺ! أطيعى أباك قالت والذى بعثك بالحق، لا أتزوج حتى تخبرنى ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صد يدا أودما، ثم ابتلعته، ما أدت حقه, قالت: والذى بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، فقال النبى ﷺ: لاتنكحوهن إلابإذنهن.

অর্থাৎ জনৈক সাহাবা নিজের মেয়েকে নিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, আমার এই মেয়ে বিবাহ করতে অস্বীকার করে। এতদ শ্রবণে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত মেয়েকে সম্বোধন করে বললেন, তোমার পিতার কথা মেনে নাও। (অর্থাৎ বিবাহে রাজি হয়ে যাও) উত্তরে ওই মেয়ে বলল, ওই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, স্ত্রীর উপর স্বামীর হক্বের বিশদ বিবরণ না দেয়া পর্যন্ত আমি বিবাহ করব না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, স্ত্রীর ওপর স্বামীর হক্ব হলো, যদি স্বামীর শরীরে কোনো ফোঁড়া, ঘা হয় আর স্ত্রী নিজের জিহ্বা দ্বারা তা চেটে দেয় অথবা স্বামীর নাকের দুই ছিদ্র পুঁজ বা রক্ত উদ্‌গিরণ করে আর স্ত্রী তা গলাধঃকরণ করে তবুও সে তার স্বামীর হক্ব আদায় করতে পারবে না। এ কথা শুনে ওই মেয়েটি বলল, যিনি আপনাকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন তার কসম! আমি কখনো বিবাহ করব না। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা তোমাদের মেয়েদেরকে তাদের সম্মতি ছাড়া বিবাহ দিওনা। (মুসনাদে বাযযার হা. ১৪৬৫, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৪/৩০৭)

উপরোক্ত দুটি হাদীসের প্রথমটিকে আল্লাহর হক্ব রক্ষা করতে না পারার কারণে আর দ্বিতীয় হাদীসে বান্দার হক্ব আদায়ে অক্ষম হওয়ার কারণে অবিবাহিত থাকার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

তাহকীক ও গ্রন্থনায় :
মুফতী নূর মুহাম্মদ

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপ্টিক্যাল কো.

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
পাইকারী ও খুচরা দেশী বিদেশী চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা, ১২১৫
ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরল পথ-১০

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন :

পূর্বোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমামে আযম আবু হানীফা (রহ.) যুগশ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ ও ফক্বীহ ছিলেন। আর ফিক্বহের উৎস হলো কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। কাজেই ফক্বীহ ও মুজতাহিদের জন্য ফিকহের উৎসসমূহের ওপর সর্বোচ্চ পর্যায়ের পাণ্ডিত্য থাকা অপরিহার্য একটি বিষয়। সুতরাং কাউকে ফকীহ স্বীকার করে নেয়ার পর এই প্রশ্ন তোলা যে, হাদীসের ওপর তার দখল ছিল না নিতান্তই যুক্তিহীন ও গর্হিত কাজ। আহলে হাদীস ভাইয়েরা বলে বেড়ান যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল ছিলেন, তার মাত্র সতেরটি হাদীস জানা ছিল। পীর মাওলানা যুলফিকার আলী (দা.বা.) এই ভিত্তিহীন প্রোপাগান্ডার মোক্ষম জবাবটি প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, ব্যাপারটি যদি বাস্তবিকই এমন হয়ে থাকে তাহলে তো হানাফী মাযহাবকে আমরা আরও মজবুতভাবে আঁকড়ে থাকব; কিছুতেই এর থেকে বিচ্যুত হব না, কারণ মাত্র সতেরটি হাদীসের ওপর গবেষণা করে যিনি দ্বীনের সকল বিষয়ে কমপক্ষে পাঁচ লক্ষাধিক ফিকহী মাসাঈল উম্মতকে উপহার দিতে পারেন এবং হাজার বছরেরও অধিককাল ধরে তা কিতাবের পাতায় ও উম্মতের আমলের খাতায় অবিকলভাবে সংরক্ষিত থাকতে পারেন, তাঁর মাযহাব না মেনে উপায় কী?!

ইমামে আযমের প্রতি হাদীস না জানার অপবাদ আরোপকারীদেরকে কে বোঝাবে যে, স্বল্প পরিমাণে হাদীস বর্ণনা করা আর হাদীস জানা না থাকা এক বিষয় নয়। দুধ থেকে মিষ্টিদ্রব্য প্রস্তুতকারীকে দুধও বিক্রি করতে হবে এমন উদ্ভট শর্ত কেউ আরোপ করেছে কোনো দিন? রেওয়ায়েত কম বলে সাইয়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হাদীস বর্ণনা কম জানতেন। কিংবা হাদীস শাস্ত্রে তিনি দুর্বল ছিলেন এমন দাবি করে নিজের মুর্খতা জানান দিতে তো গণ্ডমুর্খও রাজি হবে না।

বস্তুত আল্লাহ তা'আলা একেক জনকে একেক কাজের প্রতি আগ্রহীও রুচিশীল করে সৃষ্টি করেছেন। বহুকাজে দক্ষতা ও পারদর্শিতা সত্ত্বেও সময়ের দাবি ও রুচি বৈচিত্র্যের কারণে কর্মবিশেষের প্রতি মানুষের ঝোঁক ও প্রবল আগ্রহ থাকে। ফলে মানুষ সে কাজে তার মেধাও শ্রম অকাতরে বিলিয়ে দেয়। তারপর এক সময় অন্য সকল পারদর্শিতা ছাপিয়ে সেই কর্মবিশেষের সঙ্গেই তার নাম ও যশ ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা ইমামে আযম (রহ.) কে ফিকহের আগ্রহও রুচি সর্বাধিক পরিমাণে দান করেছিলেন। আর ফিকহ সংকলন ও ছিল সময়ের দাবি। ফলে বহু বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ও পারদর্শিতা সত্ত্বেও তিনি ফকীহ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। যেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন ইমাম বুখারী (রহ.) মুহাদ্দিস হিসেবে। অথচ তিনি একজন মুজতাহিদ ফকীহও ছিলেন।

এত হলো যুক্তির কথা, এবার হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আযম (রহ.)-এর পাণ্ডিত্য, বুৎপত্তি ও উৎকর্ষের ব্যাপারে শাস্ত্রবিশেষজ্ঞ ও সর্বজন মান্য মনীষীদের উক্তির প্রতি নজর ফেরানো যাক।

হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে ইমামে আযমের দেশ সফর ও তার উস্তাদবৃন্দ :

কুফা নগরীর অধিবাসী হওয়ায় স্বভাবতই এই শহরে তার হাদীস শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়। ইমাম সাহেবের কুফানগরীর মুহাদ্দিস উস্তাদগণ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কুফার ৯৩ (তিরানব্বই) জন মুহাদ্দিস তাবেঈ ও তাবে তাবেঈ থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর কুফানগরীর ২৯ জন হাদীসের উস্তাদের অধিকাংশই ছিলেন বড় বড় তাবেঈ। তাদের মধ্যে ইমাম শা'বী, সালামা ইবনে কুহাইল, মুহারিব ইবনে দিসার, আ'মাশ, ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ, আদী ইবনে মারসাদ, আমর ইবনে মুররাহ প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কুফানগরীর পর হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি বসরা গমন করেন। এ শহরে তার হাদীসের উস্তাদ ছিলেন হযরত হাসান বসরী, শু'বা, কাতাদা প্রমুখ বিশিষ্ট

তাবেঈগণ। তারপর এতোদুদ্দেশ্যে হারামাইন শরীফাইনসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ সফর করে সমকালীন শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদে পরিণত হন। মক্কা নগরীতে তার হাদীসের অন্যতম উস্তাদ ছিলেন আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহ.)। হাফেয যাহাবী (রহ.) বলেন, وسمع الحديث من عطاء ابن ابى رباح بمكة "ইমাম আবু হানীফা (রহ.) মক্কায় আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহ.) হতে হাদীস শিক্ষা করেছেন। (তারীখে বাগদাদ ১৩/৪৫০)

হারেস ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, كنانكون عند عطاء بعضنا خلف بعض فاذا جاء أبو حنيفة اوسع له وادناه আমরা বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহ.)-এর দরসে একজনের পেছনে আরেকজন উপবেশন করতাম। যখন আবু হানীফা (রহ.) উপস্থিত হতেন আতা (রহ.) তার জন্য মজলিস প্রশস্ত করে দিতেন এবং তাকে কাছে নিয়ে বসাতেন (মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস পৃ:১৯)

হাদীস অন্বেষণের উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশের এসব সফর শেষে ইমামে আযম (রহ.) এ শাস্ত্রের সকল শাখায় কী পরিমাণ গভীরতা ও বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন তা তারই এক শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মুখে শুনুন। তিনি বলেন,

ان ابا حنيفة اذا استنبط مسئلة ذهبت الى شيوخ الكوفة لجمع الاحاديث فرجعت واسمعته الاحاديث ليفرح فيتكلم فى الاحاديث كلها فلا يحتج به ثم قال: انا اعلم بعلم اهل الكوفة

অর্থ : ইমাম আবু হানীফা (রহ.) যখন দলিল উল্লেখ না করে কোনো মাসআলা বর্ণনা করতেন, আমি তাঁর বর্ণিত মাসআলার সমর্থনে হাদীস সংগ্রহ করতে কুফার মুহাদ্দিসগণের নিকট গমন করতাম। তারপর ফিরে এসে সংগৃহীত হাদীসগুলো তাকে শোনাতাম যেন তিনি খুশি হন। হাদীসগুলো শ্রবণ করে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সকল হাদীসের বক্তব্য ও বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করে বলে দিতেন যে, এগুলো দ্বারা দলিল পেশ করা যাবে না। তারপর বলতেন, কুফাবাসীদের নিকট যত ইলম আছে তার সবই আমার জানা (মানাকিবে আবী হানীফা মোল্লা আলী কারী)

হাদীস শাস্ত্রে ইমামে আযম (রহ.)-এর বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা প্রাজ্ঞতা ও উচ্চ মাকাম সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি :

১. জারহ ও তা'দীলের ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন,

كان ابو حنيفة ثقة صدوقا فى الفقه والحديث مامونا على دين الله.

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ফিকহ ও হাদীস উভয় শাস্ত্রে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী ছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রে আস্থাভাজন। (তারীখে বাগদাদ ১৩/৪৫০)

২.ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উস্তাদ মক্কী ইবনে ইবরাহীম (রহ.) বলেন,

كان ابو حنيفة زاهدا عالما راغبا فى الاخرة صدوق اللسان احفظ اهل زمانه

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) দুনিয়া বিমুখ, আলেমে দ্বীন, আখেরাত অনুরাগী, সত্যভাষী, ও যুগশ্রেষ্ঠ হাফেযে হাদীস ছিলেন। (মানাকিবুল ইমামিল আযম, ছদরুল আইম্মা মক্কী (রহ.) পৃ: ১৭০)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) বলেন, كان لله ورعا حافظا للسنة "আল্লাহর কসম! আবু হানীফা (রহ.) সর্বাধিক খোদাভীরু ও হাফেযে হাদীস ছিলেন।" (মানাকিবে আবী হানীফা, মুওয়াফ্ফক মক্কী-১৮০)

৪. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান (রহ.) বলেন, انه والله لاعلم هذه الامة بما جاء عن الله وعن رسوله "আল্লাহর শপথ করে বলছি, আবু হানীফা (রহ.) আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের হাদীস সম্পর্কে এই উম্মতের সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি।" (আল ইমাম ইবনে মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান পৃ: ৫১, মুকাদ্দিমাতু কিতাবিত তা'লীম ১৩৪)

৫. প্রখ্যাত তাবেঈ ইসরাঈল (রহ.) বলেন, كان نعم الرجل النعمان ماكان احفظه لكل حديث فيه فقه "ইমাম আবু হানীফা নুমান এক বিস্ময়কর ব্যক্তি। কী আশ্চর্যজনকভাবেই না তিনি ফিকহসম্বলিত সকল হাদীস মুখস্ত করে নিয়েছিলেন।" (তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৩৯)

৬. ইমাম খালক ইবনে আইয়ুব (রহ.) বলেন,

صار العلم من الله الى محمد ﷺ ثم صار الى اصحابه ثم صار الى التابعين ثم صار الى ابى حنيفة واصحابه فمن شاء فليرض ومن شاء فليسخط

ইলমে শরীয়ত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দান করা হয়েছে। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইলম সাহাবীদের নিকট পৌঁছেছে। তাদের (রা.) ইলম তাবেঈদের নিকট পৌঁছেছে। অবশেষে তাবেঈদের ইলম আবু হানীফা (রহ.) ও তার শিষ্যদের নিকট পৌঁছেছে। অতএব যার ইচ্ছা সে সন্তুষ্ট হোক আর যার ইচ্ছা অসন্তুষ্ট

হোক। (তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৩৬)

৭. খতীবে বাগদাদী (রহ.) ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

كان ابوحنيفة لا يحدث بالحديث الاما يحفظ ولا يحدث ما لا يحفظ

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কখনো মুখস্ত নেই–এমন হাদীস বর্ণনা করতেন না। (তারীখে বাগদাদ ১৩/৪৪৯)

৮. যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও মুফাসসির আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) বলেন,

كان ابوحنيفة ثقة لا يحدث بالحديث الا ما يحفظ ولا يحدث بما لا يحفظ

আবু হানীফা (রহ.) বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি কেবল মুখস্ত হাদীসই বর্ণনা করতেন, যা তার মুখস্ত নেই তিনি তা বর্ণনা করতেন না।

৯. ইয়াহইয়া ইবনে নসর (রহ.) বলেন,

سمعت اباحنيفة يقول! عندى صناديق من الحديث ما اخرجت منها الا اليسير الذى ينتفع به

আমি আবু হানীফা (রহ.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমার নিকট হাদীসের বহু সিন্দুক রয়েছে। তা থেকে উপকারী অল্প কিছু হাদীসই আমি বর্ণনা করেছিমাত্র। (আল খাইরাতুল হিসান পৃ: ২১১)

১০. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উস্তাদ আলী ইবনুল জা'দ (রহ.) বলেন,

ابوحنيفة اذا جاء بالحديث جاء به مثل الدر

আবু হানীফা যখন হাদীস বর্ণনা করেন মনে হয় যেন মণি-মুক্তা বর্ষণ করছেন। (অর্থাৎ কেবল সহীহ ও মূল্যবান হাদীসগুলো বর্ণনা করেন।) (মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা, আ: রশীদ নুমানকৃত পৃ: ৫৮, জামিউ মাসানীদিল ইমামিল আযম, খাওয়ারিজমী ২/৩০৮)

১১. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী (রহ.) বলেন,

كان ابوحنيفة من كبار حفاظ الحديث واعيانهم ولولا كثرة اعتنائه بالحديث ما تهيأله استنباط مسائل الفقه

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বড় বড় হাফেযে হাদীস ও শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিসগণের অন্তর্ভুক্ত। তিনি যদি হাদীসের প্রতি অত্যাধিক মনোযোগী না হতেন তাহলে ফিকহের এত মাসআলা উদ্ভাবন করা তার পক্ষে সম্ভব হতো না। (আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিস পৃ: ২৮৪)

১২. ইমাম সাহেবের বিশিষ্ট শাগরেদ ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন,

مارأيت احدا اعلم بتفسير الحديث من ابى حنيفة وكان ابوحنيفة ابصر بالحديث الصحيح منى

হাদীসের ব্যখ্যা বিশ্লেষণের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আমি আর কাউকে দেখিনি। তিনি সহীহ হাদীস সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। (আল খাইরাতুল হিসান পৃ. ২১)

১৩. একবার ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) কে আবু হানীফা (রহ.)-এর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন,

عدل ثقة ماظنك بمن عدله ابن المبارك ووكيع

আবু হানীফা (রহ.) বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। যাকে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ও ওয়াকী (রহ.)-এর মতো ব্যক্তিবর্গ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তার ব্যাপারে তোমার কী ধারণা? (মুকাদ্দামাতু কিতাবিল আসার পৃ: ৮)

১৪. উকুদুজ জুমান নামক গ্রন্থে আছে,

كان بصيرا بعلل الاحاديث والتعليل والتجريح

আবু হানীফা (রহ.) হাদীসের ইলাল, জরহ ও তাদীল (হাদীসের সনদ ও মতনের ত্রুটি বিচ্যুতিবিষয়ক সূক্ষ্মতর বিচারবোধ) সম্পর্কে দূরদর্শী ও বোদ্ধা ছিলেন, (উকুদুজ জুমান লি মানাকিবে আবী হানীফাতান নুমান পৃ: ১৬৮)

১৫. বুখারী ও মুসলিম শরীফের অন্যতম বর্ণনাকারী ইমাম শু'বা (রহ.) বলেন,

كان والله حسن الفهم جيدالحفظ

আল্লাহর কসম করে বলছি, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর বুঝশক্তি উৎকৃষ্ট পর্যায়ের আর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। (আল খাইরাতুল হিসান পৃ: ৩৪)

১৬.আবু দাউদ শরীফ প্রণেতা ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানী (রহ.) বলেন,

رحم الله ما لكا كان اماما رحم الله الشافعى كان اماما رحم الله اباحنيفة كان اما ما

আল্লাহ তা'আলা মালেক, শাফেয়ী ও আবু হানীফার প্রতি করুণা বর্ষণ করুন। তারা তো ইমাম ছিলেন। অর্থাৎ উম্মতের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.)-এর মতো জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস কাউকে মুসলমানদের ইমাম হিসেবে আখ্যায়িত করবেন আর তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল হবেন, এটা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়।)

১৭.শাইখুল ইসলাম ইয়াযিদ ইবনে হারুন (রহ.) বলেন,

كان ابوحنيفة نقيا تقيا زاهدا عابدا عالما صدوق اللسان احفظ اهل زمانه

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) পবিত্রাত্মা, খোদাভীরু, দুনিয়াবিমুখ, ইবাদাতগুজার, যবরদস্ত আলিম, সত্যভাষী এবং

সমকালীন সকলের চেয়ে বড় হাফেযে হাদীস ছিলেন। (মুকাদ্দিমাতু কিতাবিল আসার পৃ: ৮, মানাকিবু আবী হানীফা, সাইমূরী)

১৮. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহ.) কে একবার ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

هوثقة ما سمعت احدا ضعفه هذا شعبة ابن الحجاج يكتب اليه ان يحدث ويأمره وشعبة شعبة!!

ইমাম আবু হানীফা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। (হাদীসের ক্ষেত্রে) আমি কাউকেই তাকে দুর্বল বলতে শুনিনি। এই যে বিখ্যাত মুহাদ্দিস শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ তিনি স্বয়ং আবু হানীফা (রহ.) কে হাদীস বর্ণনা করতে চিঠি লিখেছেন এবং তাকে এ ব্যাপারে আদেশ করেছেন। আর ইমাম শু'বাতো শু'বাই। অর্থাৎ তার মতো হাদীস বিশেষজ্ঞ বিরল। সুতরাং তিনি যাকে চিঠি দিয়ে হাদীস বর্ণনা করার নির্দেশ দেন তার সম্পর্কেই বা তোমাদের কী ধারণা। (তাযকিরাতুল হুফফায ১/১৬৮, আল জাওয়াহিরুল মুযিয়্যা ১/৫৬)

১৯. ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ বলেন,

قدانتخب ابوحنيفة كتاب الاثار من اربعين الف حديث "ইমাম আবু হানীফা (রহ.) চল্লিশ হাজার হাদীস হতে বাছাই করে কিতাবুল আসার গ্রন্থটি সংকলন করেন।" (আল খাইরাতুল হিসান পৃ: ২১১)

২০. ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন,

مارايت احداقدمه على وكيع وكان يفتى برأى ابى حنيفة وكان يحفظ حديثه كله وكان قد سمع من ابى حنيفة حديثا كثيرا

আমি ইমাম ওয়াকী'র ওপর প্রাধান্য দেয়া যায়–এমন কাউকে দেখিনি। অথচ তিনিও ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতানুযায়ী ফাতওয়া দিতেন; তার সকল হাদীস মুখস্ত করতেন। আর তিনি তার থেকে প্রচুরসংখ্যক হাদীস শিক্ষা করেছেন। (হাশিয়ায়ে মুসনাদুল ইমামিল আযম পৃ. ৬১, মুকাদ্দামাতু ই'লাইস সুনান পৃ. ১৬)

২১. ইমাম আ'মাশ (রহ.) বলেন,

يامعشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة وانت ايها الرجل اخذت بكلا الطرفين

হে ফকীহ সম্প্রদায়! তোমরা উম্মতের চিকিৎসক আর আমরা মুহাদ্দিসগণ ওষুধ বিক্রেতা। আর হে আবু হানীফা! আপনি একাধারে চিকিৎসকও ওষুধ বিক্রেতাও। (অর্থাৎ আপনি ফকীহও মুহাদ্দিসও) (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ ২/৮৪)

২২. খতীবে বাগদাদ (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনে দাউদ কোরাইবীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলেছেন,

يجب على اهل الاسلام ان يدعوا لابى حنيفة فى صلاتهم لحفظه عليهم السنة والفقه

"মুসলমানদের উচিত প্রত্যেক নামাযের পর আবু হানীফা (রহ.)-এর জন্য দু'আ করা। কারণ, তিনি তাদের জন্য হাদীস ফিকহ সংরক্ষণ করেছেন।" (তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৪৪)

২৩. লা মাযহাবী বন্ধুদের গর্ব ও অনুসৃত ইমাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর একটি বক্তব্য পেশ করেই এ আলোচনা শেষ করতে চাচ্ছি। তিনি বলেন,

ائمةاهل الحديث والتفسير والفقه مثل ائمة الاربعة واتباعهم

চার ইমাম ও তাদের শিষ্যদের ব্যক্তিবর্গই হচ্ছেন, হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্রের ইমাম। (মিনহাজুস সুন্নাহ ১/১৭২)

উপর্যুক্ত জগদ্বিখ্যাত মনীষীবৃন্দের বক্তব্য ও বিশেষত; আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর মন্তব্যের দ্বারা নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, ইমামে আযম আবু হানীফা (রহ.) শুধু একজন ফকীহই ছিলেন না; তিনি ছিলেন দ্বীনি সকল বিষয়ে এবং সকল শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞ পণ্ডিত। বিশেষত; হাদীস শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী একজন সূক্ষ্মদর্শী মুহাদ্দিস ও সূদক্ষ হাদীস বিশারদ। আজ যারা নিজেদের জ্ঞানের দৈন্য অথবা নির্ভেজাল শত্রুতার বশে ইমাম সাহেবকে হাদীস শাস্ত্রে অজ্ঞ ও দুর্বল বলে প্রচার করেন তাদের প্রতি আরজ, অনুগ্রহপূর্বক উটপাখির নীতি অবলম্বন করবেন না। কাগজ-কলমের অপব্যবহার করে উপর্যুক্ত মনীষীদের সব মন্তব্যকেই না হয় ধুমড়ে-মুছড়ে দিবেন কিন্তু ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন আর আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা (রহ.) কে কিভাবে পিঠ দেখাবেন; আল্লাহর দিকে তাকিয়ে আপন মত পথকে পুনর্বিবেচনা করে দেখুন। আল্লাহর বাণী শাশ্বত ও চিরন্তন "আর যারা আমার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালায় আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে উপনীত করব।" (সুরা আনকাবুত, আয়াত ৬৯)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

লেখক : শায়খুল হাদীস ও মুফতী জামিয়া রহমানিয়া, মোহাম্মদপুর ঢাকা।

মদীনা সনদ

(পূর্ণাঙ্গ বিবরণ)

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হুসাইন

পশ্চিমা বিশ্ব যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত ধর্ম ও লিঙ্গ বৈষম্যের ভিত্তিতে শাসকরা মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করত যথেচ্ছভাবে। এমনই অন্ধকার সময়ে সবচেয়ে পতিত আরব সমাজে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানবতার মুক্তির দূত হিসেবে আগমন করলেন মরুভূমিখ্যাত মক্কা নগরীতে। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর দীর্ঘ ১৩ বৎসর সুশীতল শান্তির পথে আহ্বান জানালেন বহুদাবিভক্ত আরব জাতিকে। ডাকলেন পৌত্তলিকতা ছেড়ে একত্ববাদের দিকে। কিন্তু বাস্তবতা হলো হিতে বিপরীত। তারা মহানবীর ডাকে সাড়া দেওয়ার পরিবর্তে আরম্ভ করে দিল সর্ব প্রকারের নির্যাতন, ষড়যন্ত্র ও খোদাদ্রোহী সব কর্মকাণ্ড। উদ্ধত হলো মহানবীকে হত্যা, মহানবীর ইলাহী মিশনকে হত্যা ও তাঁর অনুসারীদের হত্যাসহ নানাবিধ বহুমাত্রিক নির্যাতনের স্টিমরোলার চালানোর। মহান আল্লাহ নির্দেশ দিলেন তাঁর হাবীবকে মদীনায় হিজরত করার। সেই নির্দেশনা বাস্তবায়িত হলো ধীরে ধীরে। মহানবী (সা.) চলে গেলেন প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে খেজুরের দেশ মদীনা মুনাওয়ারায়। তখন সেখানে অবস্থান করত বহুগোত্রের ও বহুধর্মের অনুসারীরা।

পশ্চিমা দুনিয়া নিজেদেরকে মানবাধিকার রক্ষার প্রবক্তা হিসেবে দাবি করলেও ইউরোপ-আমেরিকায় মানবাধিকার, উদার নৈতিক রাজনীতি প্রবর্তনের বহু আগেই ৬২২ খৃ: মহনবী (সা.) উপস্থাপন করেছিলেন মানবতার মুক্তির এমন এক রূপরেখা, যা মানবজাতিকে সর্বপ্রথম নানা মতভেদ ও বৈরিতা সত্ত্বেও একটি সংঘাতপূর্ণ সমাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও পরস্পরের প্রতি হিংসা, হানাহানি, রক্তপাত ও উৎখাতের রাজনীতির বদলে সকল মতপার্থক্য সত্ত্বেও মুসলমান, ইহুদী, খ্রিস্টান ও প্যাগানদের নিজ নিজ ধর্মীয় আত্মপরিচয় অক্ষুণ্ন রেখেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করার নিশ্চয়তা স্বরূপ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি বিধৃত করে প্রণয়ন করেন ঐতিহাসিক মদীনা সনদ। এ সংবিধানের আওতায় গঠিত হয় মদীনা নামের রাষ্ট্রের এবং এতে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গোষ্ঠীগত হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানির অবসান ঘটে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে উঠে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য।

সব সম্প্রদায়ের মানুষ সুযোগ পায় শান্তিময় নিরাপদ জীবনযাপনের। স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম পালনের। হোক সে মুসলমান, ইহুদী, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক কিংবা ভিন্ন কোনো ধর্মাবলম্বী। অথচ তখন চার্চ ও সামন্তবাদের কঠোর অনুশাসনে পশ্চিমা সমাজ শৃঙ্খলিত ছিল। মদীনা সনদের ৬শ বছর পর ১২১৫ খৃ: ইউরোপে মানবাধিকারের প্রথম সনদ ম্যাগনাকাটা ঘোষিত হয়। ব্রিটিশ বিল রাইটস ঘোষিত হয় ১৬৮৯ খৃ: এবং মার্কিন বিল অব রাইটস ঘোষিত হয় এর ও ১০০শ বছর পর ১৭৮৯ সালে।

সাংবিধানিকভাবে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষকে সেখানে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নিশ্চয়তা দেয়া হলেও ধর্ম-বর্ণ ও লিঙ্গভেদের কারণে এখনো নানা রকম বৈষম্যের শিকার হচ্ছে মানুষ। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এই মদীনা সনদ সূত্রেই পৃথিবীতে উদ্ভব হয় আইনের শাসনের। নিশ্চিত করে মানবাধিকার, নারীর অধিকার, সামাজিক অধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সংখ্যালঘুদের অধিকার। তাই দেখা যাক কী আছে মদীনা সনদে।

যা আছে মদীনা সনদে :

ধারা নং-১

সাংবিধানিক ডকুমেন্ট

هذا كتاب من محمد النبى (رسول الله) ﷺ

ইহা আল্লাহর নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে লিখিত সংবিধান।

ধারা নং-২

রাষ্ট্রের প্রজার ধরন ও প্রকৃতি

بين المؤمنين والمسلمين من قريش واهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم

এই চুক্তি সম্পাদিত হলো কুরাইশের মুসলমান এবং মদীনাবাসী ও তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের মাঝে এবং যারা তাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। ওই সব গোষ্ঠীকে মদীনার সরকারের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার অধীনস্ত মনে করা হবে।

ধারা নং-৩

রাষ্ট্রের জাতীয়তা গঠন

انهم امة واحدة من دون الناس

সারা দুনিয়ার অন্যান্য লোকের বিপরীতে তাদের এক স্বতন্ত্র জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হবে।

ধারা-৪

মোহাজের কুরাইশদের জন্য হত্যাকারীর উপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণবিষয়ক পূর্বের গোত্রীয় আইন বলবত থাকবে।

المهاجرون من قريش على ربعتهم ويتعاقلون بينهم معاقلهم الاولى، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين

কুরাইশ বংশের মধ্য থেকে যারা হিজরত করবে তারা আপন মহল্লার দায়িত্বে থাকবে। তারা রক্তমূল্য সবাই মিলে পরিশোধ করবে এবং নিজেদের বন্দিদের মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করবে সাথে সাথে এটাও লক্ষ রাখবে যে ঈমানদারদের মধ্যে পারস্পরিক আচরণ সৎ এবং ইনসাফভিত্তিক হতে হবে।

ধারা নং-৫

বনু আউফ গোত্রের জন্য হত্যাকারীর উপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণবিষয়ক গোত্রীয় আইনকে দৃঢ়করণ।

وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

এবং বনু আউফ স্বীয় মহল্লার জিম্মায় হবে। তারা পূর্বের ন্যায় নিজেদের ওপর অর্পিত রক্তমূল্য তথা দিয়্যাত সবাই মিলে পরিশোধ করবে এবং প্রতিটি গ্রুপ নিজেদের বন্দিদের নিজেরা মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করবে। সাথে সাথে মুমিনদের পারস্পরিক আচার-আচরণ ন্যায় ও ইনসাফনির্ভর হতে হবে।

ধারা নং-৬

বনু হারেস গোত্রের জন্য হত্যাকারীর উপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণবিষয়ক তাদের গোত্রীয় পূর্বেকার আইনকে বৈধতা দান।

وبنو حارث (بن الخزرج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

এবং বনু হারেস বিন খাজরাজ নিজ গোত্রের জিম্মায় হবে। তারা পূর্বের আইন ও সিদ্ধান্ত মতে নিজেদের ওপর অর্পিত রক্ত মূল্য সবাই মিলে গোত্রীয়ভাবে পরিশোধ করবে। এবং প্রত্যেকে নিজেদের বন্দিকে মুক্তিপণ আদায় করে মুক্ত করে আনবে। পাশাপাশি লক্ষ রাখতে হবে মুমিনদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ইনসাফ ও সততানির্ভর হওয়াকে।

ধারা নং-৭

বনু সায়েদার জন্য হত্যাকারীর ওপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ সম্পর্কীয় তাদের গোত্রীয় পূর্বেকার নির্ধারিত আইন সুদৃঢ়করণ।

وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

এবং বনু ছায়েদা নিজ গোত্রের জিম্মায় থাকবে এবং পূর্বের আইন ও সিদ্ধান্ত মতে নিজেদের ওপর অর্পিত রক্তমূল্য সবাই মিলে গোত্রীয়ভাবে পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেকে নিজেদের বন্দিকে মুক্তিপণ আদায় করে মুক্ত করে আনবে। পাশাপাশি লক্ষ রাখতে হবে মুমিনদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ইনসাফ ও সততানির্ভর হওয়ার প্রতি।

ধারা নং-৮

বনু জুশামের জন্য হত্যাকারীর ওপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ সম্পর্কীয় তাদের গোত্রীয় পূর্বেকার নির্ধারিত আইন সুদৃঢ়করণ।

وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفةتفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

এবং বনু জুশাম নিজ গোত্রের জিম্মায় থাকবে। তারা পূর্বের আইন ও সিদ্ধান্ত মতে নিজেদের ওপর অর্পিত রক্তমূল্য সবাই মিলে গোত্রীয়ভাবে পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেকে নিজেদের বন্দিকে মুক্তিপণ আদায় করে মুক্ত করে আনবে। পাশাপাশি লক্ষ রাখতে হবে মুমিনদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ইনসাফ ও সততানির্ভর হওয়ার প্রতি।

ধারা নং-৯

বনু নাজ্জারের জন্য হত্যাকারীর ওপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ সম্পর্কীয় তাদের গোত্রীয় পূর্বেকার নির্ধারিত আইন সুদৃঢ়করণ।

وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفةتفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

এবং বনু নাজ্জার নিজ গোত্রের জিম্মায় থাকবে। তারা পূর্বের আইন ও সিদ্ধান্ত মতে নিজেদের ওপর অর্পিত রক্তমূল্য সবাই মিলে গোত্রীয়ভাবে পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেকে নিজেদের বন্দিকে মুক্তিপণ আদায় করে মুক্ত করে আনবে। পাশাপাশি লক্ষ রাখতে হবে মুমিনদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ইনসাফ ও সততানির্ভর হওয়ার প্রতি।

ধারা নং-১০

বনু আমর ইবনে আওফের জন্য হত্যাকারীর ওপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ সম্পর্কীয় তাদের গোত্রীয় পূর্বেকার নির্ধারিত আইন সুদৃঢ়করণ।

وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

এবং বনু আমর ইবনে আওফ নিজ গোত্রের জিম্মায় থাকবে। তারা পূর্বের আইন ও সিদ্ধান্ত মতে নিজেদের ওপর অর্পিত রক্তমূল্য সবাই মিলে গোত্রীয়ভাবে পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেকে নিজেদের বন্দিকে মুক্তিপণ আদায় করে মুক্ত করে আনবে। পাশাপাশি লক্ষ রাখতে হবে মুমিনদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ইনসাফ ও সততানির্ভর হওয়ার প্রতি।

পাশাপাশি লক্ষ রাখতে হবে মুমিনদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ইনসাফ ও সততানির্ভর হওয়ার প্রতি।

ধারা নং-১১

বনু নাবীতের জন্য হত্যাকারীর ওপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ সম্পর্কীয় তাদের গোত্রীয় পূর্বেকার নির্ধারিত আইন সুদৃঢ়করণ।

وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

এবং বনু নাবীত নিজ গোত্রের জিম্মায় থাকবে। তারা পূর্বের আইন ও সিদ্ধান্ত মতে নিজেদের ওপর অর্পিত রক্তমূল্য সবাই মিলে গোত্রীয়ভাবে পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেকে নিজেদের বন্দিকে মুক্তিপণ আদায় করে মুক্ত করে আনবে। পাশাপাশি লক্ষ রাখতে হবে মুমিনদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ইনসাফ ও সততানির্ভর হওয়ার প্রতি।

ধারা নং-১২

বনু আওসের জন্য হত্যাকারীর ওপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ সম্পর্কীয় তাদের গোত্রীয় পূর্বেকার নির্ধারিত আইন সুদৃঢ়করণ।

وبنو الاوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

এবং বনু আওস নিজ গোত্রের জিম্মায় থাকবে। তারা পূর্বের আইন ও সিদ্ধান্ত মতে নিজেদের ওপর অর্পিত রক্তমূল্য সবাই মিলে গোত্রীয়ভাবে পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেকে নিজেদের বন্দিকে মুক্তিপণ আদায় করে মুক্ত করে আনবে। পাশাপাশি লক্ষ রাখতে হবে মুমিনদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ইনসাফ ও সততানির্ভর হওয়ার প্রতি।

ধারা নং-১৩

সকল সম্প্রদায়ের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে আইন ও বিচার পালনের বিধান।

وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

প্রত্যেক গ্রুপ মুক্তিপণ আদায় করে নিজেদের বন্দিদেরকে মুক্ত করে আনবে এবং এর আওতায় সর্বস্তরের মুসলমানদের মধ্যে আইন ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে।

ধারা নং-১৪

আইন বাস্তবায়নে শৈথিল্য সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ।

وان المؤمنين لايتركون مفرحا بينهم ان يعطوه بالمعروف فى فداء او عقل

যাদের দায়িত্বে মুক্তিপন ও রক্তমূল্য অর্পিত এবং যারা ঋণভারে নিমজ্জিত এ ধরনের ব্যক্তিকে সকল মুসলমান সহযোগিতা করবে।

ধারা নং-১৫

কাউকে অন্যায় সহযোগিতা করা যাবে না।

وان لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه

এবং কোনো মুসলমান অন্য মুসলমানের চুক্তিবদ্ধ ভাইয়ের সাথে তার সম্মতি ছাড়া চুক্তি করতে পারবে না।

ধারা নং-১৬

অন্যায়, জুলুম, পাপ এবং সর্বপ্রকার নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

وان المؤمنين المتقين ايديهم على كل من بغى منهم او ابتغى دسيعة ظلم واثما او عدوانا او فسادا بين المؤمنين وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد احدهم

এবং প্রত্যেক মুত্তাকী মুসলমানের হাত ওই সমস্ত লোকের মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকবে, যারা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এবং জবরদস্তিমূলক কিছু হাসিল করতে উদ্ধত হবে অথবা পাপ বা সীমালঙ্ঘন করবে। অথবা নিরাপদ শহরবাসী মুসলমানদের মধ্যে নৈরাজ্য ও ত্রাস সৃষ্টি করবে। ওই সব লোকের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। ওই ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী তাদের কারো সন্তানও যদি হয়।

ধারা নং-১৭

কোনো মুসলমান কোনো মুসলমানকে হত্যার নিষেধাজ্ঞা।

ولا يقتل مؤمن مومنا فى كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن

এবং কোনো মুসলমান কোনো মুসলমানকে কোনো কাফিরের মুকাবিলায় হত্যা করবে না এবং কোনো কাফেরকে কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে কোনো প্রকারের সাহায্য করবে না।

ধারা নং-১৮

সর্বস্তরের মুসলমানের জন্য জানের নিরাপত্তা প্রদানের সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ ও গ্যারান্টি প্রদান।

وان ذمة الله واحد يجير عليهم ادناهم

আল্লাহ তা'আলার নিরাপত্তা একই ধরনের অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনস্থ যেকোনো সাধারণ মুসলমানও যদি কাউকে আশ্রয় দেয় তা বাস্তবায়ন সবার জন্য অনিবার্য হবে।

ধারা নং-১৯

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় মুসলিম উম্মাহ পৃথক জাতিসত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

وان المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس

এবং ঈমানদাররা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় একে অপরের ভাই ভাই হবে।

ধারা নং-২০

সংখ্যালঘু ইহুদী সম্প্রদায়ের জানের নিরাপত্তার অধিকার ও মুসলমানদের সমান হবে।

وانه من تبعنا من يهود فان له النصر

وانه لا يحل لمؤمن اقرا بما فى هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الآخر ان ينصر محدثا او يؤويه، وان من نصره، او آواه، فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل۔

এবং এমন কোনো ঈমানদারের জন্য যিনি এই সংবিধানের সাংবিধানিক ধারাগুলো যথাযথভাবে পরিপালনের অঙ্গীকার করেছেন এবং আল্লাহ ও পরকালের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তার জন্য কখনো বৈধ হবে না যে, সে কোনো খুনিকে সাহায্য করবে বা আশ্রয় দেবে এবং যে বা যারা খুনিকে সাহায্য করবে বা আশ্রয় দেবে রোজ কিয়ামতে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ এবং গজব নাযিল হবে এবং তার কোনো প্রকারের দান বা বিনিময় গ্রহণ করা হবে না।

ধারা নং-২৮

সর্বপ্রকারের ঝগড়া, বিবাদ, মোকাদ্দমার ক্ষেত্রে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হবে।

وانكم مما اختلفتم فيه من شئ فان مرده الى الله والى محمد۔

এবং যখনি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতানৈক্য ও বিরোধ দেখা দেবে তখন সেটা আল্লাহ এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। কেননা সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এরই হাতে।

ধারা নং-২৯

ইহুদীদের ওপর সমান দায়িত্ব অর্পিত হবে যুদ্ধব্যয়ের ক্ষেত্রে।

وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين

এবং ইহুদীরা ততক্ষণ পর্যন্ত আহত ভাইবোনদের প্রতিশোধ শত্রু পক্ষ থেকে মুসলমানরা নেবে।

ধারা নং-২৪

ইসলামই সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা-

وان المؤمنين المتقين على احسن هدى واقومه

এবং নিশ্চয় নিঃসন্দেহে মুমিন-মুত্তাকীরা সর্বোত্তম এবং সরল পথে পরিচালিত।

ধারা নং-২৫

শত্রুকে জানমালের নিরাপত্তা প্রদানের নিষেধাজ্ঞা-

وانه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن

এবং মদীনার অমুসলিম নাগরিকদের মধ্য থেকে কেউ মূর্তি পূজক কুরাইশ বংশের কারো জানমালের নিরাপত্তা দিতে পারবে না এবং তাদের স্বার্থে কোনো মুসলমানের প্রতিপক্ষও হতে পারবে না।

ধারা নং-২৬

মুসলমানদের হত্যার দায়ে কিসাসের বিধান প্রচলনকরণ-

وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قودبه، الا ان يرضى ولى المقتول (بالعقل) وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الاقيام عليه۔

এবং যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে স্বেচ্ছায় হত্যা করবে এবং তা প্রমাণিত হবে তার থেকে কিসাস নেওয়া হবে। তবে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক যদি রক্তমূল্য তথা দিয়্যাতের ওপর রাজি হয়ে যায় তখন কিসাস মাফ হবে এবং সর্বস্তরের মুসলমানেরা এই কিসাস বাস্তবায়নের জন্য স্বোচ্চার হবে এবং কিসাস নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় গ্রহণ করা তাদের জন্য বৈধ হবে না।

ধারা নং-২৭

চুক্তি লঙ্ঘন করার মাধ্যমে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদেরকে কোনো প্রকারের নিরাপত্তা ও ছাড় দেওয়া হবে না।

وانه لا يحل لمؤمن اقرا بما فى هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الآخر ان ينصر محدثا او يؤويه، وان من نصره، او آواه، فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل۔

والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم

এবং ইহুদীদের মধ্য থেকে যারা আমাদের মদীনার রাজত্ব মেনে নেবে তারা সহযোগিতা এবং সমঅধিকার পাবে এবং তা বলবত থাকবে যতক্ষণ তারা কোনো মুসলমানের ওপর জুলুম অথবা তাদের বিরুদ্ধে কোনো শত্রুর সাহায্য সহযোগিতা না করবে।

ধারা নং-২১

সমস্ত মুসলমানদের জন্য ইনসাফ ও সমতার ওপর ভিত্তি করে সমান নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

وان سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مومن دون مومن فى قتال فى سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم

এবং সর্বস্তরের ঈমানদারের নিরাপত্তা চুক্তি একই মানের হবে। আল্লাহর পথে জিহাদ করার প্রাক্কালে কোনো মুসলমান অন্য মুসলমানকে বাদ দিয়ে শত্রুপক্ষের সাথে কোনো প্রকারের সমঝোতা চুক্তি করতে পারবে না, যতক্ষণ না এই সমঝোতা চুক্তি সবার জন্য সমান হবে না।

ধারা নং-২২

পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সহযোগিদের জন্য সাহায্যের বিধান।

وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا۔

এবং ওই সকল গ্রুপকে যারা আমাদের সাথে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে পালাক্রমে তাদেরকে ছুটি প্রদান করা হবে।

ধারা নং-২৩

মুসলমানদের জন্য একে অপরের স্বার্থে সশস্ত্র প্রতিশোধ নেওয়ার বিধান-

وان المؤمنين يبيئ بعضهم عن بعض بما نال دماء هم فى سبيل الله

এবং আল্লাহর পথে নিজেদের নিহত

মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবে, যত দিন তারা মুসলমানদের সাথে মিলে যুদ্ধ করবে।

ধারা নং-৩০

মুসলমান এবং অমুসলিম সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ।

وان يهود بنى عوف امة مع المومنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وانفسهم الا من ظلم واثم فانه لا يوتغ الا نفسه واهل بيته۔

এবং বনী আউফ গোত্রের ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে এ রাজনৈতিক ঐক্য মনে করা হয়। ইহুদীদের জন্য তাদের নিজস্ব ধর্ম এবং মুসলমানদের জন্য তাদের আপন ধর্ম। রাজনৈতিক ঐক্য সত্ত্বেও প্রত্যেকে নিজেরা এবং তাদের অনুসারীরা স্ব-স্ব ধর্ম পালন করবে। তবে কেউ যদি অন্যায় বা চুক্তি লঙ্ঘনের মত অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তখন সে এবং তার পরিবারের সদস্যরা ব্যতীত অন্যদের জড়ানো যাবে না।

ধারা নং-৩১

বনী নাজ্জারের ইহুদীরাও বনী আউফের ইহুদীদের সাথে সব অধিকারে সমান হবে।

وان ليهود بنى النجار مثل ماليهود بنى عوف

এবং বনী নাজ্জারের ইহুদীদেরও বনী আউফের ইহুদীদের ন্যায় অধিকার হাসিল হবে।

ধারা নং-৩২

বনী হারেসের ইহুদীদের ও বনী আউফের ইহুদীদের ন্যায় সব বিষয়ে সমান অধিকার থাকবে।

وان ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بنى عوف

এবং বনী হারেসের ইহুদীদেরও বনী আউফের ইহুদীদের মতো সমান অধিকার অর্জিত হবে।

ধারা নং-৩৩

বনী সা'য়েদার ইহুদীদেরও বনী আউফের ইহুদীদের ন্যায় সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার থাকবে।

وان ليهود بنى ساعدة مثل ما ليهود بنى عوف

এবং বনী সা'য়েদার ইহুদীরাও বনী আউফের ইহুদীদের সমান অধিকার পাবে সর্বক্ষেত্রে।

ধারা নং-৩৪

বনী জুশামের ইহুদীরাও বনী আউফের ইহুদীদের মতো সব বিষয়ে সমান অধিকার পাবে।

وان ليهود بنى جشم مثل ماليهود بنى عوف

এবং বনী জুশামের ইহুদীরাও বনী আউফের ইহুদীদের বরাবর অধিকার হাসিল করবে।

ধারা নং-৩৫

বনী আউসের ইহুদীরাও বনী আউফের ইহুদীদের সাথে সব অধিকারে সমান হবে।

وان ليهود بنى الاوس مثل ماليهود بنى عوف

এবং বনী আউসের ইহুদীরাও বনী আউফের ইহুদীদের সমান অধিকার অর্জন করবে।

ধারা নং-৩৬

বনী ছা'লাবার ইহুদীরা বনী আউফের ইহুদীদের মতো সর্বপ্রকারের অধিকারে সমান হবে।

وان ليهود بنى ثعلبة مثل ماليهود بنى عوف، الا من ظلم واثم فانه لايوتغ الا نفسه واهل بيته۔

এবং বনী ছা'লাবার ইহুদীরাও বনী আউফের ইহুদীদের মতো সমান অধিকার পাবে তবে যে বা যারা অন্যায় অথবা চুক্তি লঙ্ঘনের মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়বে সে নিজে এবং তার পরিবারের সদস্যরা ছাড়া অন্য কেউ বিপদে পড়বে না।

ধারা নং ৩৭

বনী ছা'লাবার শাখা গোত্র জাফনার ইহুদীরা বনী আউফের ইহুদীদের মতো সব অধিকারে সমতা পাবে।

وان جفنة بطن من ثعلبة كانفسهم

এবং জাফনা গোত্রের ইহুদীরাও যারা ছা'লাবা গোত্রের একটি শাখা ওই সব অধিকার অর্জন করবে, যা ছা'লাবা গোত্র অর্জন করবে।

ধারা নং-৩৮

বনী শুতাইবার ইহুদীরা বনী আউফের ইহুদীদের ন্যায় সব বিষয়ে সমান অধিকার পাবে।

وان لبنى الشطيبة مثل ماليهود بنى عوف، وان البردون الاثم

এবং বনী শুতাইবার ইহুদীরা ও বনী আউফের ইহুদীদের ন্যায় সমান অধিকার হাসিল করবে এবং প্রণীত এই সংবিধান মতে চলবে, সংবিধান লঙ্ঘন করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না।

ধারা নং-৩৯

ছা'লাবা গোত্রের মিত্ররাও সমস্ত অধিকারে তাদের সমান হবে।

وان موالى ثعلبة كانفسهم

এবং ছা'লাবা গোত্রের মিত্ররাও ওই সব অধিকার অর্জন করবে, যা ছা'লাবা গোত্রের জন্য প্রযোজ্য।

ধারা নং-৪০

ইহুদীদের সব শাখার জন্য সব অধিকারে সমতা

وان بطانة يهود كانفسهم

এবং ইহুদীদের মূল গোত্রের অধীনস্থ শাখা গোত্রগুলোর ও মূল গোত্রের সমান অধিকার অর্জিত হবে।

ধারা নং-৪১

সামরিক তৎপরতা পরিচালনার জন্য মূল কমান্ড ও অথরিটি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এরই থাকবে।

وانه لا يخرج منهم احد الا باذن محمد

এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ সামরিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুমতি ছাড়া বের হতে পারবে না।

ধারা নং-৪২

কেসাসের বিধানের ঊর্ধ্বে কেউ না

وانه لا ينحجز على ثأ رجرح

এবং কোনো আক্রমণ বা মারের প্রতিশোধ নেওয়ার মধ্যে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না।

ধারা নং-৪৩

অন্যায়ভাবে হত্যার দায়িত্ব

وانـه من فتك فبنفسه فتك واهل بيته الا من ظلم وان الله على ابر هذا۔

যে ব্যক্তি হত্যা করবে সে এবং তার পরিবারের সদস্যরা তার জন্য দায়ী হবে, তবে সে যদি তার ওপর অত্যাচার ঠেকাতে গিয়ে হত্যা করে তার দায় সে নেবে না। যে ব্যক্তি এই সংবিধানকে সমুন্নত রাখবে এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা দেবে, আল্লাহ তার সহায় হবেন।

ধারা নং-৪৪

যুদ্ধাবস্থায় মুসলমান ও ইহুদীরা স্ব-স্ব ব্যয়ভার নিজেরাই বহন করবে।

وان عـلـى اليهـود نـفـقتهـم وعـلـى المسلمين نفقتهم

এবং ইহুদীদের ওপর তাদের ব্যয়ভার বর্তাবে এবং মুসলমানদের ওপর তাদের খরচপাতির দায়িত্ব থাকবে।

ধারা নং-৪৫

যুদ্ধকালীন সময়ে একে অপরের বাধ্যতামূলক সহযোগিতা প্রদান

وان بينهـم الـنصر على من حارب اهل هذه الصحيفة

এবং যে কেউ এই সংবিধানের অনুসারীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে তখন ইহুদী এবং মুসলমান একে অপরকে বাধ্যতামূলক সহায়তা, সাহায্য সহযোগিতা করবে।

ধারা নং-৪৬

পরস্পর সংলাপ ও সমঝোতা

وان بينهـم الـنصح والنصيحة والبردون الاثم

এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সংলাপ ও একে-অপরের কল্যাণ কামনা করতে হবে। আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। অবিশ্বাস ও চুক্তি লঙ্ঘন নয়।

ধারা নং -৪৭

চুক্তি ভঙ্গের বিরোধিতা ও মজলুমকে সাহায্য করার বিধান

وانـه لا يـأثـم امـرء بـحـليفه، وان النصر للمظلوم

কোনো পক্ষ বা দল নিজেদের কোনো মিত্রের কারণে চুক্তি লঙ্ঘন বা ভঙ্গ করবে না এবং অবশ্যই মজলুমের সহায়তা করবে।

ধারা নং-৪৮

সংখ্যালঘু অমুসলিম ইহুদীরা ও যুদ্ধকালীন সময়ে রাষ্ট্রকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

وان اليهـود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين

এবং ইহুদীরা অতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে যুদ্ধব্যয় বহন করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা উভয়ে মিলেমিশে লড়তে থাকবে শত্রুপক্ষের সাথে।

ধারা নং-৪৯

রাষ্ট্রের অধীনস্থ বিভিন্ন বিবদমান গ্রুপ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ ও হত্যাযজ্ঞ পরিচালনার ওপর নিষেধাজ্ঞা

وان يثـرب حـرم جـوفهـا لاهـل هـذه الصحيفة

এবং মদীনার পেট তথা পাহাড়বেষ্টিত ময়দান এই সংবিধান মান্যকারীদের জন্য হবে হারম অর্থাৎ নিরাপদ ভূমি এখানে পরস্পরে যুদ্ধ করা বা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ধারা নং-৫০

সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাধীন প্রত্যেক ব্যক্তি সমানভাবে জানের নিরাপত্তা পাবে।

وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم

আশ্রিতদের সাথে ওই আচরণই করা হবে, যা আশ্রয়দাতার সাথে করা হয়ে থাকে। তাকে ক্ষতির সম্মুখীনও করা হবে না এবং তার জন্য চুক্তি লঙ্ঘনের বৈধতা ও থাকবে না।

ধারা নং-৫১

মহিলাদের আশ্রয় দেওয়া ও হেফাজত করার বিধান

وانه لا تجار حرمة الاباذن اهلها

এবং কোনো মহিলাকে তার পরিবারের সম্মতিক্রমেই আশ্রয় দেওয়া হবে।

ধারা নং-৫২

এমন ঝগড়া, বিবাদে যা মারামারি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ওই সব বিষয়ে আল্লাহ এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সিদ্ধান্ত ও এখতিয়ারই চূড়ান্ত হবে।

وانـه مـاكان بين اهل هذه الصحيفة من حـدث، او اشتـجـار يخاف فساده فان مـرده الـى الـلـه والى محمد رسول الله ﷺ وان الـلـه عـلـى اتـقـى مـافى هذه الصحيفة وابره۔

এবং এই সংবিধানের অনুসারীদের মধ্যে যেকোনো ধরনের ঝগড়া ও বিবাদ পরিলক্ষিত হবে, যার দ্বারা শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা সৃষ্টি হয় এ পর্যায়ে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এবং আল্লাহ ওই ব্যক্তির সাথে যে সর্বাধিক সতর্কতা, আন্তরিকতার সাথে এই সংবিধানকে সমুন্নত রাখবে ও বাস্তবায়ন করবে।

ধারা নং-৫৩

মদীনা রাষ্ট্রের কোনো শত্রু বা তাদের কোনো মিত্রকে মদীনায় আশ্রয় দেওয়া

যাবে না।

وانه لا تجار قريش ولا من نصرها

এবং কুরাইশ ও তাদের কোনো মিত্রকে আশ্রয় দেওয়া যাবে না

ধারা নং-৫৪

রাষ্ট্র যদি শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয় রাষ্ট্রকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা সবার সম্মিলিত দায়িত্ব।

وان بينهم النصر على من دهم يثرب

কোনো বাহিরের আক্রমণের সময় মদীনা রাষ্ট্রকে রক্ষা করা ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সবার সম্মিলিত দায়িত্ব।

ধারা নং-৫৫

প্রত্যেক গ্রুপের জন্য নিরাপত্তা চুক্তির বাধ্যবাধকতা অনিবার্য হবে।

واذا دعوا الى صلح يصالحوه ويلبسونه فانهم يصالحوه و يلبسونه، وانهم اذا دعوا الى مثل ذلك فانه لهم على المؤمنين

এবং যদি ওই সব ইহুদীদের কোনো সমঝোতায় আমন্ত্রণ জানানো হয় তখন তারাও সমঝোতা করবে এবং তাতে অংশীদার থাকবে এবং তারা যদি এমন কোনো বিষয়ে আমন্ত্রণ জানায়, তখন মুসলমানদের দায়িত্ব হবে তাদের সাথে তেমনি করা অর্থাৎ সমঝোতা করে নেওয়া।

ধারা নং-৫৬

কোনো প্রকারের চুক্তি ধর্মের হেফাজতের দায়িত্বকে রহিত করতে পারবে না।

(فانه لهم على المؤمنين) الا من حارب فى الدين

তদ্রুপ মুসলমানদের জন্য জরুরি হবে যে যদি তাদের কোনো নিরাপত্তা চুক্তিতে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় তাহলে তা পরিপূর্ণ পরিপালন করা। তবে ধর্ম যুদ্ধের বিষয় তা থেকে ভিন্ন।

ধারা নং-৫৭

চুক্তিবদ্ধ প্রত্যেক দল বা গ্রুপের দায়িত্ব বর্তাবে তারা প্রতিপক্ষের দিক থেকে যে কোনো আক্রমণ প্রতিহত করবে।

على كل اناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم

প্রত্যেক দল/গ্রুপের দায়িত্বে তাদের সাইডের আক্রমণকে প্রতিহত করা

ধারা নং-৫৮

এই সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও তাদের মিত্ররা একই ধরনের সাংবিধানিক মর্যাদার অধিকারী হবে।

وان يهود الاوس مواليهم وانفسهم على مثل مالاهل هذه الصحيفة مع البر المحض من اهل هذه الصحيفة

এবং আউস গোত্রের ইহুদী এবং তাদের মিত্ররা ওই সব অধিকার হাসিল করবে যা সংবিধান পন্থীদের হাসিল হবে এবং তারাও এই সংবিধান পন্থীদের সাথে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পূর্ণ আচরণ করবে।

ধারা নং-৫৯

সংবিধানের বিরোধিতার অনুমতি কারো থাকবে না।

وان البر دون الاثم لايكسب كاسب الا على نفسه۔

এবং সংবিধান মানতে হবে বিরোধিতা করা যাবে না, যে যে রকম করবে, তাকে তদ্রুপ ভোগতে হবে। ওই ভাগ্যবরণ করতে হবে যেমন তার কর্ম।

ধারা নং-৬০

আল্লাহর সাহায্য সংবিধান বাস্তবায়নের শর্তে শর্তাধীন থাকবে।

وان الله على اصدق مافى هذه الصحيفة وابره

এবং আল্লাহ ওই ব্যক্তির সাথে যে সর্বোচ্চ সততা এবং আন্তরিকতার সাথে এই সংবিধানকে বাস্তবায়ন করবে সাংবিধানিক ধারাগুলোর উপর যথাযথভাবে চলবে।

ধারা নং-৬১

কোনো সন্ত্রাসী, বিদ্রোহীকে এই সংবিধান নিরাপত্তা দেবে না।

وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم او آثم

এবং এই সাংবিধানিক ডকুমেন্ট কোনো সন্ত্রাসী বা বিদ্রোহীকে কোনো প্রকারের প্রোটেকশন দেবে না।

ধারা নং-৬২

সর্বস্তরের নিরপরাধ শহরবাসীর জন্য নিরাপত্তা ও হেফাজত নিশ্চিত করা হবে।

وانه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة الا من ظلم و اثم

এবং যে বা যারা যুদ্ধে যাবে, তারাও নিরাপত্তা পাবে আর যারা মদীনায় বসে থাকবে তাদের জন্যও নিরাপত্তা থাকবে। তবে যারা সন্ত্রাস করবে, সংবিধান লঙ্ঘন করবে, আইন অমান্য করবে তাদেরকে এ সংবিধান নিরাপত্তা দেবে না।

ধারা নং-৬৩

আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিরপরাধ এবং নিরাপদ ও সংবিধান মান্যকারী সর্বস্তরের শহরবাসীর জন্য মুহাফিজ ও গ্যারান্টিদাতা।

وان الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله ﷺ

যে বা যারা এই সংবিধান মান্য করবে সৎ ও নিরপরাধ থাকবে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার হেফাজতকারী হবেন।

সূত্র :

আল বেদায়া ওয়াননেহায়া, সুনানে আবীদাউদ, তবকাতে ইবনে সা'আদ, মীসাকে মদীনা ইত্যাদি।

কোয়ান্টাম মেথড-১৩

অমুসলিমদের প্রতি উদারতা

মুফতী শরীফুল আ'জম

শূন্য কোঠার জ্ঞান নিয়ে বর্তমান সময়ে যে বিষয় নিয়ে উদ্দম আলোচনায় মত্ত হওয়া যায় তা হচ্ছে ইসলাম। ধর্মের প্রতি উদাসীনতার একটি কুফল এটি। যে যার মতো ইসলামকে সংজ্ঞায়িত করে নিজেকে ধার্মিক পরিচয় দিচ্ছে। নিজস্ব ব্যাখ্যা সাপেক্ষে ধর্ম পালন মহামারী আকার ধারণ করেছে। ইসলামের উদারতার দোহাই দিয়ে কেহ ধর্মের বিধিবিধানে কাটছাঁট করে মডার্ন বানাচ্ছে। আবার কেহ ইসলামের স্বকীয়তা ক্ষুণ্ন করে সকল ধর্মের সাথে একে গুলিয়ে ফেলছে। জ্ঞানী-গুণী, শিক্ষিত মানুষের মুখে 'ধর্মের কোনো বাড়াবাড়ি নেই', 'অন্যের দেবতাকে গালি দিওনা' বা 'ধর্ম যার যার' ইত্যাদি বুলির খৈ ফুটতে দেখা যায়। মূলত পবিত্র কুরআনের কতক আয়াতের সঠিক তাফসীর না জানাতে এই ভুলের সূত্রপাত। সমাজের এহেন হ-য-ব-র-ল অবস্থার মাঝে কোয়ান্টাম মেথড ঢিল ছুঁড়তে ভুল করেনি। ইসলামের উদারতার অপব্যাখ্যা করতে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত বিকৃতরূপে উল্লেখ করেছে কোয়ান্টাম কণিকায়। কোয়ান্টাম তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে হক্ব-বাতিলে তফাত মিটিয়ে দিয়েছে। ইসলামের উদারতার দোহাই দিয়ে সকল ধর্মকে সত্যধর্ম ইসলামের সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট রয়েছে। বস্তুত ইসলাম ভিন ধর্মের প্রতি উদার ঠিক তবে সেই উদারতার নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ও সীমারেখা রয়েছে। আজকের আলোচনায় বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হবে।

ঈমান-আমলের ব্যাপারে উদারতা নয় : উদারতা, সদ্ব্যবহার ও শান্তি অন্বেষায় ইসলামের সাথে কোনো ধর্মের তুলনা হয় না। কিন্তু এই উদারতা মানবিক অধিকার ও ব্যক্তিগত বিষয়ে হয়ে থাকে। ঈমান-আক্বীদা বা আল্লাহর আইন ও ধর্মের মূলনীতিতে কোনো প্রকার উদারতার অবকাশ নেই। এ ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে হক্ব বাতিলের মাঝে সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী, তদুপরি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোনো পথ অবলম্বন করতে চাই। প্রকৃত পক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছি অপমানজনক আযাব। আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর তাঁর রাসূলের ওপর এবং তাদের কারো প্রতি ঈমান আনতে গিয়ে কাউকে বাদ দেয়নি, শীঘ্রই তাদেরকে প্রাপ্য সওয়াব দান করা হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (সূরা আন নিসা ১৫০-১৫২)

এখানে ঈমানদার ও বেঈমানের পরিণতি স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। কুফরে অটল থেকে কেহ পরকালে পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে না। সেথায় সফলতা আর সুখ-শান্তি একমাত্র ঈমানদারের প্রাপ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। ঈমান-আমলের প্রশ্নে উদারতার কোনো স্থান নেই। বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ মা'আরিফুল কুরআনে উক্ত আয়াতসমূহের তাফসীরে বলা হয়েছে- কুরআন হাকীমের উপরোক্ত স্পষ্ট ঘোষণা "ওইসব বিভ্রান্ত লোকদের হীনমন্যতা ও গোঁজামিলকেও ফাঁস করে দিয়েছে, যারা অন্যান্য ধর্মানুসারীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজেদের ধর্ম মত ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিজাতির পদমূলে উৎসর্গ করতে ব্যগ্র। যারা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ফায়সালাকে উপেক্ষা করে অন্যান্য ধর্মানুসারীদের বোঝাতে চায় যে, মুসলমানদের মতেও শুধু ইসলামই একমাত্র মুক্তিসনদ নয়, বরং ইহুদী ও খ্রিস্টানরাও তাদের নিজ নিজ ধর্মে-কর্মে স্থির থেকে পরকালে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। অথচ তারা অধিকাংশ রাসূলকে অথবা অন্তত; কোনো কোনো পয়গাম্বরকে অমান্য করে। ফলে তাদের কাফের ও জাহান্নামি হওয়ার কথা অত্র আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে।"

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অমুসলমানদের প্রতি ইনসাফ, ন্যায়নীতি, সমবেদনা, সহানুভূতি, উদারতা ও এহসান বা হিতকামনার দিক দিয়ে ইসলাম নজিরবিহীন। কিন্তু উদারতা বা সহানুভূতি ব্যক্তিগত অধিকারের আওতায় হয়ে থাকে, যা আমরা যেকোনো ব্যক্তিকে উৎসর্গ করতে পারি। অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ বা অনাধিকার চর্চা করা যাবে না। ইসলাম একদিকে অমুসলমানদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও পরম সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে যেমন উদার ও অবারিত দ্বার, অপরদিকে স্বীয় সীমারেখা সংরক্ষণের ব্যাপারে অতি সতর্ক, সজাগ ও কঠোর। ইসলাম

অমুসলমানদের প্রতি উদারতার সাথে সাথে কুফরী ও কুপ্রথার প্রতি পূর্ণ ঘৃণা প্রকাশ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমান ও অমুসলমানরা দুটি পৃথক জাতি এবং মুসলমানদের জাতীয় প্রতীক ও স্বাতন্ত্র সযত্নে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র বজায় রাখলে চলবে না বরং সামাজিকতার ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে হবে। এ কথা কুরআন ও হাদীসে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন পাক ও ইসলামের অভিমত যদি এই হতো যে, যেকোনো ধর্ম মতের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা সম্ভব, তাহলে ইসলাম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। হযরত রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জিহাদ পরিচালনা করা এমনকি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াত ও কুরআন নাযিল করা নিরর্থক হতো। (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিকা)

পরীক্ষকের উদারতা :

অমুসলমানদের প্রতি ইসলামের উদারতাকে পরীক্ষকের উদারতার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। পরীক্ষার হলে ছাত্রকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। ভুল-সঠিক যাচ্ছেতাই সে লিখতে পারে। পরীক্ষক তার ভুল বুঝতে পারলেও লিখতে বাঁধা দেন না বরং উদারতার পরিচয় দিয়ে তিন ঘণ্টা সময় তাকে স্বাধীনভাবে লিখতে দেন, তবে এই উদারতা কিন্তু ভুলের স্বীকৃতি নয় নিছক পরীক্ষা মাত্র। খাতা দেখার সময় কোনো প্রকার ছাড় দেয়া হবে না। তদ্রূপ অমুসলমানদের প্রতি ইসলাম যে উদারতার বিধান রেখেছে তা দুনিয়ার এ পরীক্ষার হলেই সীমাবদ্ধ। এখানে কুফর পালনের স্বাধীনতা দেয়া হলেও শেষ বিচারের দিন ছাড় দেয়া হবে না। ভুলের খেসারত তখন অবশ্যই দিতে হবে। তাই ইসলামের এই উদারতাকে কুফর-শিরকের স্বীকৃতি ভাবার কোনো অবকাশ নেই। অসংখ্য আয়াত ও হাদীসে কুফর-শিরকের ভয়াবহ পরিণতির কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে সতর্ক করা হয়েছে।

ধর্ম যার যার :

অনেক জ্ঞানী-গুণী শিক্ষিত ভাইদের মুখে সুরা কাফিরুনের একটি আয়াত–

لكم دينكم ولى دين

(লাকুম দ্বীনুকুম) এ ধরনের আলোচনায় জোরালোভাবে তুলে ধরতে দেখা যায়। এ আয়াত থেকে ধর্ম যার যার থিউরি প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। আয়াতের সঠিক অনুবাদ ও অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট জানা না থাকায় মূলত তাদের এ ভুলটির সূত্রপাত।

তাবারানী এর সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, কাফেররা প্রথমে পারস্পরিক শান্তির স্বার্থে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে এই প্রস্তাব রাখল যে, আমরা আপনাকে বিপুল পরিমাণে ধনৈশ্বর্য দেব, ফলে আপনি মক্কার সর্বাধিক ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাবেন। আপনি যে মহিলাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবেন। বিনিময়ে আপনি শুধু আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলবেন না। যদি আপনি এটাও মেনে না নেন, তবে এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদত করব এবং এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যের ইবাদত করবেন। (মাযহারী)

আবু সালেহ এর রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মক্কার কাফেররা পারস্পরিক শান্তির লক্ষ্যে এই প্রস্তাব দিল যে, আপনি আমাদের কোনো প্রতিমার গায়ে কেবল হাত লাগিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সত্য বলব। এর পরিপ্রেক্ষিতে জিবরাঈল (আ.) সূরা কাফিরুন নিয়ে আগমন করলেন। এতে কাফেরদের ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং আল্লাহ তা'আলার অকৃত্রিম ইবাদতের আদেশ আছে। (তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন)

ইরশাদ হচ্ছে- "বলুন, হে কাফেরকুল। আমি ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত করো। এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি। এবং আমি ইবাদতকারী নই, যার ইবাদত তোমরা করো। তোমরা ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্য। (সূরা কাফিরুন) অর্থাৎ আমি এক্ষণে কার্যত তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করি না এবং তোমরা আমার উপাস্যের ইবাদত করো না এবং ভবিষ্যতেও এরূপ হতে পারে না।

উক্ত সূরায় শেষ আয়াত–

لكم دينكم ولى دين

এর বিকৃত অনুবাদ ধর্ম যার যার মতবাদের উৎস। এর সঠিক অনুবাদ হচ্ছে دين (দ্বীন) শব্দটি এখানে প্রতিদান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সূরা ফাতেহায় مالك يوم الدين এর মাঝে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থ প্রতিদান দিবসের অধিপতি। এখানে دين(দ্বীন) অর্থ ধর্ম নয়। অতএব তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম অনুবাদ করা ভুল। তাফসীর বিশারদগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন- لكم دينكم এর অর্থ এরূপ নয় যে, কুফর করার অনুমতি অথবা কুফরে বহাল থাকার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে বরং এর সারমর্ম হলো- "যেমন কর্ম তেমন ফল।" (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

বোঝা গেল যে, মক্কার কাফেরদের পক্ষ

থেকে দেয়া শান্তি চুক্তির প্রস্তাবটি ইসলামের মূল শিক্ষা তাওহীদের পরিপন্থী হওয়ায় কঠোরভাবে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ইসলামের উদারতা আপন জায়গায় ঠিক আছে কিন্তু ধর্মের মূলনীতির ব্যাপারে কোনো রূপ ছাড় নেই। কাজেই সূরা কাফিরুন এ ধরনের উদারসন্ধি নিষিদ্ধ করেছে। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিভিন্ন সময় কাফেরদের সাথে সন্ধি বা শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু এসকল চুক্তির কোনো ধারাতে ইসলামের মূলনীতি বিরুদ্ধ কোনো বিষয় ছিল না। বরং সর্বত্র ইসলামের বড়ত্ব প্রকাশ করা হয়েছে আর অন্য সকল ধর্মের অসারতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। যার যার ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে কিন্তু সকল ধর্মের স্বীকৃতি বা বৈধতা দেয়া হয়নি। "ধর্ম যার যার" এ কথার শিক্ষা ইসলামে নেই, আছে "যেমন কর্ম তেমন ফল" এ কথার শিক্ষা। ঈমান-আমলের ফল জান্নাত আর কুফর-শিরকের ফল জাহান্নাম। ইরশাদ হচ্ছে- "যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে। তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (সূরা আন নাযিআত-৩৭-৪১)

পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ :

অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলাম যে উদারতার ও ইনসাফের পরিচয় দিয়েছে অন্যান্য জাতির ইতিহাসে তা একান্তই বিরল। এ ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। বন্ধুত্ব, অনুগ্রহ সদ্ব্যবহার, সহানুভুতি ও সমবেদনার পারস্পরিক পার্থক্য এবং প্রত্যেকটির স্বরূপ নির্ণয় করে দেয়া হয়েছে। দুই ব্যক্তির অথবা দুই দলের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

১. একটি স্তর হলো, আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসার। এই স্তরের সম্পর্ক একমাত্র মুসলমানদের সাথেই হতে পারে। অমুসলমানদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করা কিছুতেই জায়েয নয়। (সূরা আলে ইমরান-২৮)

২. সমবেদনার স্তর, এর অর্থ সহানুভূতি, শুভাকাঙ্ক্ষা ও উপকার করা। এই স্তরের সম্পর্ক যুদ্ধরত অমুসলিম সম্প্রদায় ছাড়া সব অমুসলমানদের সাথে স্থাপন করা জায়েয। (সুরা মুমতাহিনা-৮)

৩. সৌজন্য ও আতিথেয়তার স্তর। এর অর্থ বাহ্যিক সদাচার ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার। এই সম্পর্কের উদ্দেশ্য যদি ধর্মীয় উপকার সাধিত করা অথবা আতিথেয়তা অথবা তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা হয়ে থাকে, তবে সব অমুসলমানের সাথেই এটা জায়েয। সূরা আলে ইমরানের ২৮ নং আয়াতে–

الاان تتقوا منهم تقة

বলে এ স্তরের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪. লেনদেনের স্তর। অর্থাৎ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা, চাকরি, শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করা। এ স্তরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করাও সব অমুসলমানের সাথে জায়েয। তবে এতে যদি মুসলমানের ক্ষতি হয় তবে জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, ইসলামে অমুসলিমদের জন্য কতটুকু উদারতা ও সদ্ব্যবহারের শিক্ষা বর্তমান রয়েছে।

বন্ধুত্ব নিষিদ্ধের কারণ :

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, কুরআন কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন এত কঠোরভাবে নিষেধ করে কেন? কোনো অবস্থাতেই এরূপ সম্পর্ক জায়েয না হওয়ার রহস্য কী? এর একটি বিশেষ কারণ এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে জগতের বুকে মানুষের অস্তিত্ব সাধারণ জীব-জানোয়ার অথবা জঙ্গলের বৃক্ষও লতা-পাতার মতো নয় যে, জন্ম লাভ করবে, বড় হবে, এর পরে মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বরং ইসলাম মনে করে যে, মানুষের জীবন একটি উদ্দেশ্যমূলক জীবন। মানুষের খাওয়া-পরা, উঠা-বসা, নিদ্রা-জাগরণ এমনকি, জন্ম-মৃত্যু সবই একটি উদ্দেশ্যের চারপার্শ্বে অবিরত ঘুরছে। এসব কাজকর্ম যতক্ষণ সে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, ততক্ষনই তা নির্ভুল ও শুদ্ধ। পক্ষান্তরে উদ্দেশ্যের বিপরীত হয়ে গেলেই তা অশুদ্ধ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য ও ইবাদতই যখন মানব জীবনের লক্ষ্য, তখন জগতের কাজকারবার, রাজ্যশাসন, রাজনীতি ও পারিবারিক সম্পর্ক সবই এ লক্ষ্যের অধীন। অতএব যে মানব এ লক্ষ্যের বিরোধী সে মানবতার প্রধান শত্রু।

বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসে এ বিষয় বস্তুটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

من احب لله وابغض لله فقداستكمل الإيمان-

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুত্ব ও শত্রুতাকে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন করে দেয়, সে স্বীয় ঈমানকে পূর্ণতা দান করে।" এতে বোঝা গেল যে, স্বীয় ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, শত্রুতা ও বিদ্বেষকে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন করে দিলেই ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। অতএব মুমিনের আন্তরিক বন্ধুত্ব এমন ব্যক্তির

সাথেই হতে পারে, যে এ উদ্দেশ্য হাসিলে তার সঙ্গী এবং আল্লাহর অনুগত। এ কারণে কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপনকারীদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, ওরা কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত। (তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন)

কোয়ান্টামের উদারতাঃ

উদারতার ইসলাম নির্ধারিত সীমা ছাড়িয়ে গেছে কোয়ান্টাম। 'যেমন কর্ম তেমন ফলে'র কথা প্রচারের পরিবর্তে 'ধর্ম যার যার' দর্শন প্রচার করে বেড়াচ্ছে। এর স্বপক্ষে তারা পবিত্র কুরআনের তিনটি আয়াতের অংশ বিশেষ বিকৃতরুপে উপস্থাপন করেছে। কোয়ান্টাম কণিকার ২৯৯ নং পৃষ্ঠায়।

১. তোমরা নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।" (নিসা-২৭১)

২. "অন্যের দেবতাকে গালি দিও না।" (আনআম-১০৮)

৩. ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই। আলোর পথ এখন সুস্পষ্ট।" (বাকারা-১৫৬)

ইসলামের কোনো বিধিবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ খণ্ডন করতে অথবা যার যার ধর্ম পালনের বৈধতা প্রমাণের ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম এ আয়াত তিনটির অপপ্রয়োগ করে থাকে। অথচ বাস্তব পক্ষে এ সকল আয়াত ইহুদী-খ্রিস্টান আর কুফর-শিরকের প্রতি ধিক্কার আর তিরস্কার জ্ঞাপনার্থে অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াত তিনটি পূর্ণাঙ্গরূপে সঠিক প্রেক্ষাপটসহ পর্যালোচনা করলেই কোয়ান্টামের গোঁজামিল স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এক.

সুরা নিসার আয়াত খানির আংশিক বাদ দিয়ে বিকৃতরূপে উপস্থাপন করেছে কোয়ান্টাম। পূর্ণ আয়াতের অনুবাদ হচ্ছে, "হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোনো কথা বলো না। নিঃসন্দেহে মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রুহ তারই কাছ থেকে আগত। অতএব তোমরা আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে মান্য করো। আর এ কথা বলো না যে, আল্লাহ তিনের এক, এ কথা পরিহার করো, তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য। সন্তানসন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমানসমূহ ও জমিনে রয়েছে সবই তাঁর। আর কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা আন নিসা-১৭১)

উক্ত আয়াতে আহলে কিতাব তথা ইহুদী খ্রিস্টানগণকে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এ বাড়াবাড়ি রোগে উভয় জাতিই আক্রান্ত হয়েছে। খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.) কে অতি ভক্তি করতে গিয়ে খোদার পুত্র সাব্যস্ত করেছে। অপর দিকে ইহুদীরা তাঁকে আল্লাহর নবী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। উক্ত আয়াতে তাদের এই কুফর শিরকের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। এবং ত্রিত্ববাদের অসারতা তুলে ধরে একত্ববাদের আওয়াজ তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু আফসোস! কোয়ান্টাম এ আয়াত থেকেই উল্টা ইহুদী খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত ধর্মের বৈধতা দিতে চায়। কুফর-শিরকের প্রতি নীরব সমর্থন ও উদারতা প্রকাশ করতে চায়। মনে রাখতে হবে, যে কাজের যে সীমারেখা শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে তা অতিক্রম করাই হচ্ছে বাড়াবাড়ি। সুন্নাহ সম্মত সীমারেখা অতিক্রম করাই ধর্মে বাড়াবাড়ি হিসেবে গণ্য হবে। অতএব অমুসলিমদের প্রতি উদারতার সীমারেখা লঙ্ঘন করে কোয়ান্টাম নিজেই বাড়াবাড়ির পথে পা বাড়িয়েছে।

দুই.

কোয়ান্টাম কণিকায় বিকৃতরূপে উল্লেখিত সূরা আল আনআমের আয়াতটির পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক অনুবাদ হচ্ছে, "তোমরা তাদের মন্দ বলো না, যাদের তারা অরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে। তাহলে তারা দৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলবে। এমনিভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্ম সুশোভিত করে দিয়েছি। অতঃপর স্বীয় পালনকর্তার কাছে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদের বলে দেবেন যা কিছু তারা করত। (সুরা আল আনআম-১০৮)

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট : ইবনে জরীরের বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতের শানে নুযুল এই, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিতৃব্য আবু তালেব যখন অন্তিম রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শত্রুতায়, নির্যাতনে এবং হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মুশরিক সর্দাররা আবু তালেবকে বলল, আপনি আমাদের মান্যবর এবং সর্দার আপনি জানেন আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ আমাদেরকে এবং আমাদের উপাস্যদেরকে ভীষণ কষ্টে ফেলে রেখেছেন। আমাদের অনুরোধ এই যে, তিনি যদি আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ না বলেন, তবে আমরা তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন করব। তিনি যেভাবে ইচ্ছা নিজ ধর্ম পালন করবেন, যাকে ইচ্ছা উপাস্য করবেন। আমরা কিছুই বলব না।

আবু তালেব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে কাছে ডেকে বললেন, এরা সমাজের সর্দার, আপনার কাছে

এসেছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতিনিধি দলকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা কী চান? তারা বলল, আমাদের বাসনা, আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকুন। আমরাও আপনাকে এবং আপনার উপাস্যকে মন্দ বলব না। এভাবে পারস্পরিক বিরোধের অবসান হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আচ্ছা যদি আমি আপনাদের কথা মেনে নিই, তবে আপনারা কি এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করতে সম্মত হবেন, যা উচ্চারণ করলে আপনারা সমগ্র আরবের অধিপতি হয়ে যাবেন। এবং অনারবরাও আপনাদের অনুগত ও করদাতায় পরিণত হয়ে যাবে।

আবু জাহল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, এরূপ বাক্য একটি নয়, আমরা দশটি উচ্চারণ করতে সম্মত। বলুন বাক্যটি কী? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" এ কথা শুনতেই তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। আবু তালেবও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বললেন, ভ্রাতাপুত্র এ কালেমা ছাড়া অন্য কথা বলুন। কেননা, আপনার সম্প্রদায় এ কালেমা শুনে ঘাবড়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : চাচাজান, আমি এ কালেমা ছাড়া অন্য কোনো কালেমা বলতে পারি না। যদি তারা আকাশ থেকে সূর্যকে নিয়ে আসে এবং আমার হাতে রেখে দেয়, তবুও আমি এ কালেমা ছাড়া অন্য কিছু বলব না। এভাবে তিনি কুরাইশ সর্দারদেরকে নিরাশ করে দিলেন। এতে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগল, হয় আপনি আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত হবেন, না হয় আমরা আপনাকেও গালি দিব এবং ওই সত্তাকেও আপনি নিজেকে যার রাসূল বলে দাবি করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়,

ولاتسبواالذين يدعون من دون الله فيسبواالله عدوا بغير علم۔

অর্থাৎ, আপনি ওই প্রতিমাদের মন্দ বলবেন না, যাদেরকে তারা উপাস্য বানিয়ে রেখেছে। তাহলে তারা আল্লাহকে মন্দ বলা শুরু করবে পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার কারণে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বভাবগত চরিত্রের কারণে শৈশবকালেও কোনো মানুষকে বরং কোনো জন্তুকে কখনো গালি দেননি। সম্ভবত কোনো সাহাবীর মুখ থেকে এমন কোনো কঠোর শব্দ বের হয়ে থাকতে পারে, যাকে মুশরিকরা গালি মনে করে নিয়েছে। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

দেব-দেবীর স্বরূপ :

এখানে প্রশ্ন হয় যে, কুরআনের অনেক আয়াতে কঠোর ভাষায় প্রতিমার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এসব আয়াত রহিত নয়। অদ্যাবধি এগুলো তেলাওয়াত করা হয়।

উত্তর এই যে, কুরআনের আয়াতে যেখানে কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে বিতর্ক হিসেবে কোনো সত্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তা বলা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে কারো মনে কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য নয় এবং কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না যে, এতে প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা কিংবা মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা হয়েছে। এ সুস্পষ্ট পার্থক্যটি প্রত্যেক ভাষার বিশেষ বাক পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারে যে, কখনো কোনো বিষয়ের তথ্য উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা হয়; যেমন সাধারণত আদালতসমূহে এরূপ হয়ে থাকে। আদালতের সামনে প্রদত্ত এ ধরনের বিবৃতিকে জগতের কেউ এরূপ বলে না যে, অমুক অমুককে গালি দিয়েছে। এমনিভাবে ডাক্তার ও হাকিমদের সামনে মানুষের অনেক দোষ বর্ণিত হয়। এগুলোই অন্যত্র ও অন্যভাবে বর্ণিত হলে গালি মনে করা হবে। কিন্তু চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এগুলো বর্ণনা করাকে কেউ গালি মনে করে না। তেমনি কুরআন পাক স্থানে স্থানে প্রতিমাদের অচেতন, অজ্ঞান, শক্তিহীন ও অসহায় হওয়ার কথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছে যাতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই তাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে নিতে পারে এবং যারা বুঝতে পারে না, তাদের ভ্রান্তি ও অদূরদর্শিতা ফুটে ওঠে। বলা হয়েছে- ضعف الطالب والمطلوب অর্থাৎ প্রতিমা ও প্রতিমার উপাসক উভয়ই দুর্বল। অন্যত্র বলা হয়েছে- انكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم অর্থাৎ, তোমরা এবং তোমাদের উপাস্য প্রতিমারা সবাই জাহান্নামের ইন্ধন। এখানেও কাউকে মন্দ বলা উদ্দেশ্য নয় পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির কু-পরিণাম ব্যক্ত করাই লক্ষ্য। (তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন)

অতএব বোঝা গেল, উক্ত আয়াতে অন্যের দেবতাকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু এতে দেব-দেবীর স্বীকৃতি দেয়া হয়নি বা তাদের পূজা অর্চনাকে বৈধ করা হয়নি। বরং কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাদের অসারতার কথা তুলে ধরে প্রকৃত স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাহলে কোয়ান্টাম কেন? ইসলামের উদারতার

দোহাই দিয়ে সকল ধর্ম পালনের বৈধতা দিচ্ছে? দেব-দেবীর অসারতার কথা কুরআনে যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কোয়ান্টাম কেন সেটা তুলে ধরছে না? এ ধরনের গোঁজামিল উদারতা নয় বরং ধোঁকা প্রতারণার শামিল।

তিন.

কোয়ান্টাম সূরা বাকারার আয়াতটিও আংশিক উল্লেখ করেছে। পূর্ণ আয়াতটি হচ্ছে- "দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী তাগুতদেরকে মানবে না এবং আল্লাহকে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙার নয়। আর আল্লাহ সবই শোনেন এবং জানেন। (সূরা আল বাকারা-২৫৬) হযরত ওমর (রা.) একজন বৃদ্ধা নাসারা স্ত্রীলোককে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তখন সে স্ত্রীলোক উত্তর দিল আমি মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধা। শেষ জীবনে নিজের ধর্ম কেন ত্যাগ করব? হযরত ওমর (রা.) এ কথা শুনেও তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি বরং এ আয়াত পাঠ করলেন-لا اكراه فى الدين অর্থাৎ ধর্মে কোন বল প্রয়োগের নিয়ম নেই। বাস্তব পক্ষে ঈমান গ্রহণে বল প্রয়োগ সম্ভবও নয়। কারণ ঈমানের সম্পর্ক বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে নয়।" তাই স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়েই ইসলাম গ্রহণ করতে হয়। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

উক্ত আয়াতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য বল প্রয়োগ করতে নিষেধ করা হয়েছে ঠিক কিন্তু এতে অন্য সব ধর্মের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি। বরং ইসলামের রজ্জু সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার মাঝেই মুক্তি নিহিত থাকার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তবে তা বিবেক বুদ্ধি খাঁটিয়ে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে হবে। জোর করে গ্রহণ করানো যাবে না। আর স্বেচ্ছায় কেহ যদি ইসলামকে গ্রহণ না করে পরকালে শেষ বিচারে তার পরিণতি কী হবে তার ঘোষণা পরের আয়াতেই দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- "যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী। চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।" (সূরা আল বাকারাহ-২৫৭)

বোঝা গেল, ঈমান গ্রহণ না করার ফলে চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। এটাই মহান রাব্বুল আলামীনের ফয়সালা। পরকালে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে ইসলাম। কোয়ান্টাম ইসলামকে যেভাবে ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত করেছে সেটা নিছক তাদের চাতুর্যতা ও মিথ্যাচার মাত্র। মুসলমানের ঈমান-আক্বীদা ধ্বংস আর অমুসলিমদের চিরস্থায়ী দোযখের বন্দোবস্ত করতেই তারা ইসলামের উদারতাকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাদের চক্রান্ত থেকে আল্লাহ পাক মুসলিম-অমুসলিম সকলকে হেফাজত করুন। আমীন!!

পবিত্র রামাযানুল মোবারক উপলক্ষে
ইমাম, উলামা ও মাদরাসার শিক্ষক-ছাত্রদের জন্য

২৫ দিন ব্যাপী
আন্তর্জাতিক মানের
ক্বেরাত প্রশিক্ষণ
২০১৩

২৫ শা'বান থেকে
২০ রামাযান ১৪৩৪ হিজরী পর্যন্ত

স্থান : জামিয়া নূরিয়া ইসলামিয়া
আশ্‌রাফাবাদ, কামরাঙ্গীর চর, ঢাকা-১২১১।

ক্বেরাতের দারস্ দেবেন:
মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা আবরারুল হক (হারদুঈ রহ.) এর বিশিষ্ট খলিফা, ১০১টি কিতাবের লেখক
আল্লামা ক্বারী আবুল হাসান আ'জমী
দেওবন্দ, ভারত

সহযোগিতায় থাকবেন :
মাওলানা ক্বারী সাইফুল ইসলাম সুনামগঞ্জী
মাওলানা ক্বারী ছিদ্দিকুর রহমান, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

ভর্তি ফি : ১২০০ টাকা। জামিয়ার পক্ষ থেকে ফ্রি খানার ব্যবস্থা থাকবে।
থাকার বিছানাপত্র সঙ্গে আনতে হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্নদের সনদ দেয়া হবে

আরজগুযার : শাহ্ আহমাদুল্লাহ আশরাফ মুহতামিম
যোগাযোগ: ৭৩২০০১১, ০১৮১৪৪৪২০১১, ০১৭১২-০৫২১৮৫

বি:দ্র: ২০ শা'বান হতে ২০ রামাযান পর্যন্ত নূরিয়া তালীমুল কোরআন বোর্ডের উদ্যোগে মুআ'ল্লিম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। যোগাযোগ : ০১৭৫২-৬৬৭৮২৩

স্মরণ
সাহাবা জীবন

হযরত তালহা (রা.)

আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

নাম ও বংশ পরিচয় :

নাম : ত্বালহা, উপনাম : আবু মুহাম্মদ। উপাধি : ফাইয়াজ। পিতার নাম : ওবাইদুল্লাহ, মাতার নাম : সা'বাহ (রা.) বংশ : কুরাইশ। তাঁর বংশপরিক্রমা ষষ্ঠ পরম্পরায় নবীয়ে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বংশের সাথে মিলিত হয়। তাঁর পিতা ওবাইদুল্লাহ নবীয়ে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। অবশ্য তাঁর মাতা হযরত সা'বাহ (রা.) দীর্ঘায়ু লাভ করেন। ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদাত বরণের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

হযরত তালহা (রা.) হিজরতের চব্বিশ/পঁচিশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন এবং নব যৌবনকালেও তিনি ব্যবসার কাজে বিভিন্ন রাষ্ট্রে সফর করেন। (সিয়ারুস সাহাবাহ ২/১০৪)

ইসলাম গ্রহণ :

একবার তিনি সতের কিংবা আঠার বছর বয়সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বর্তমান সিরিয়ার অন্তর্গত বুসরা সফর করেন। সেখানের এক পাদ্রী তাকে নবীয়ে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সুসংবাদ দেন। কিন্তু তিনি উক্ত পাদ্রীর কথা পরিপূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেননি। তবে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার পর হযরত আবু বকর (রা.)-এর সংশ্রব ও তাঁর একনিষ্ঠ উপদেশের মাধ্যমে তাঁর সকল সংশয় দূর হয়ে যায়। তাই একদিন তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে দরবারে রেসালতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি সেই আটজন ভাগ্যবান মহামনীষীদের মধ্যে একজন যারা ইসলামের প্রাথমিক যুগে সত্যের তারকার আলোক রশ্মি থেকে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ে পরিশেষে নিজেও ইসলামের উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত তালহা (রা.) অন্যান্য মুসলমানদের মতো জুলুম-নির্যাতনের স্বীকার হন। তাঁর আপন ভাই ওসমান বিন ওবাইদুল্লাহ অত্যন্ত বদমেজাজি ছিল। একদিন সে অন্য বর্ণনায় নাওফল বিন খুয়াইলিদ তাঁকে এবং হযরত আবু বকর (রা.) কে এক রশিতে বেঁধে খুবই মারল। যাতে নতুন ধর্ম ত্যাগ করেন। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। কারণ তাওহীদের স্বাদ এমন নয় যে, তা একবার গ্রহণ করলে তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যায়। (প্রাগুক্ত ২/১০৫)

হিজরত :

তিনি মক্কায় থাকাবস্থায় একেবারে নিশ্চুপ জীবন অতিবাহিত করেন এবং ইবাদত-বন্দেগির ফাঁকে ফাঁকে ব্যবসায়িক কার্যক্রমও চালিয়ে যান। যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবুবকর (রা.)-এর সাথে মদীনার দিকে হিজরত করেন তখন তিনি ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে শাম সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। পথিমধ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি সে সময় তাদের খেদমতে কিছু শামী কাপড় পেশ করেন এবং বললেন মদীনাবাসীরা আপনাদের অপক্ষোয় অস্থির। এরপর তিনি মক্কায় এসে ব্যবসায়িক কার্যক্রম থেকে শান্ত হয়ে হযরত আবুবকর (রা.)-এর পরিবার-পরিজনকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন।

যুদ্ধাভিযান :

হিজরতের দ্বিতীয় বছর থেকে আল্লাহর জমিনে তাঁর কালিমা বুলন্দ করার জন্য ইসলামের শত্রুদের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধাভিযানের পরম্পরা শুরু হয়। সর্বপ্রথম বড় যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের আকৃতিতে প্রকাশ লাভ করে। এতে হযরত তালহা (রা.) ময়দানে স্বশরীরে উপস্থিত না থাকলেও যেহেতু নবীয়ে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ কে কুরাইশের কাফেলার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য শাম সিরিয়া পাঠিয়ে ছিলেন। তাই তাঁকে ও বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গণ্য করে গনিমতের মালে শরীক করা হয় এবং নবীয়ে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- তুমি জিহাদের সওয়াব থেকেও বঞ্চিত হবে না। (সিয়ারুস সাহাবা ২/১০৬)

উহুদ যুদ্ধে নবীপ্রেমের অভিনব দৃষ্টান্ত :

তৃতীয় হিজরীতে উহুদ প্রান্তে ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেছিলেন এবং কাফেররা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানগণ যখন নিজ নিজ স্থান থেকে সরে পড়ল এবং গনিমতের মাল গোছানোর কাজে লিপ্ত হলো তখন সুযোগ বুঝে কাফেররা মুসলমানদের ওপর পেছনের দিক থেকে পাল্টা হামলা করে দিল। এই অতর্কিত আক্রমণ মুসলমানদের মাঝে সাময়িক

বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। যুদ্ধের ময়দানে হাতে গোনা কয়েকজন সাহাবী দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু তারা সবাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে দূরে ছিলেন। সে সময় শুধুমাত্র হযরত তালহা (রা.) একাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পার্শ্বে ছিলেন। তিনি সে দিন নবী প্রেমের বিরল দৃশ্য দেখিয়ে ছিলেন। চারিদিক থেকে কাফেরদের তীর বর্ষণ শুরু হলো বৃষ্টির মতো। সব শত্রুর দৃষ্টি তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে। সেই মহান পবিত্র সত্ত্বাকে হত্যা করার জন্য যখন সব কাফের মত্ত হয়ে উঠল এমন নাজুক পরিস্থিতিতে হযরত তালহা (রা.) একাই এসব হামলা প্রতিহত করছিলেন। নিজ হাতে তীর প্রতিহত করেন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বর্শা বা তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে চাইলে তিনি নিজ বুককে ঢাল হিসাবে পেশ করেন। আবার কোনো সময় কাফেরদের দল ভারী হলে সিংহের মতো লাফ দিয়ে কাফেরদের ওপর পাল্টা হামলা করে তাদেরকে কিছু পিছনে হঠিয়ে দিতেন। একবার এক দুশমন সামনে থেকেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর তরবারী দ্বারা হামলা করলে তালহা (রা.) হাত দিয়ে তা প্রতিহত করেন এবং এতে তাঁর আঙ্গুলগুলো শহীদ হয়ে যায়। কিন্তু তিনি 'উহ' শব্দও বলেননি। বরং বলেছেন حس অর্থাৎ ভালোই হয়েছে। এভাবে তিনি অনেক্ষণ যাবৎ শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। ইতোমধ্যে অন্যান্য সাহাবী উপস্থিত হলে এবং দুশমনদের হামলার মাত্রা কমে এলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে নিজ পিঠে সওয়ার করে পার্শ্বে ছোট একটি পাহাড়ে নিয়ে আসেন। সেদিন হযরত তালহা (রা.) নবী প্রেমের যে দৃষ্টান্ত দেখালেন ইতিহাসে তা বিরল। তাঁর সমস্ত শরীর চালনির মতো ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর শরীরে সত্তরের চেয়েও বেশি আঘাত গণনা করেছেন। (বুখারী শরীফ ২য় খণ্ড উহুদ অধ্যায়, হায়াতুস সাহাবা ২/৯১)

স্বভাব চরিত্র :

হযরত তালহা (রা.)-এর স্বভাব চরিত্র উচ্চ পর্যায়ের ছিল। আল্লাহর ভয় এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুহাববতে নিজের জানমাল বিলীন করে দিতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাই তিনি মান্নত করেছিলেন নিজের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবেন। এ মান্নত তিনি এমন গুরুত্বের সাথে আদায় করার চেষ্টা করেছেন যে, কুরআনে পাকে এ বিষয়ে আয়াত অবতীর্ণ হয়।

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه.

"ঈমানদারদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা আল্লাহর সাথে যা কিছু প্রতিজ্ঞা করেছে তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছে। যাদের কিছু লোক তাদের মান্নত পূর্ণ করেছে। (সুরা আহযাব-২৩)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত তালহা (রা.) দরবারে নবুওয়াতে উপস্থিত হলে নবীয়ে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তালহা! তুমিও সেসব লোকদের মধ্য থেকে যারা নিজ মান্নত পূর্ণ করেছে। (ফতহুল বারী ৮/৩৯০)

হযরত তালহা (রা.) বদান্যতায় অগ্রগামী ছিলেন। ফকির-মিসকীনদের জন্য সব সময় তাঁর দরবার খোলা থাকত। কায়স বিন হাযেম বর্ণনা করেন, "আমি তালহার চেয়ে চাওয়ার পূর্বে দান করতে অগ্রগামী কাউকে দেখিনি। (প্রাগুক্ত ৭/৬৬)

একবার তিনি হযরত ওসমান (রা.)-এর নিকট নিজের কিছু জমি ৭ লক্ষ দেরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেন এবং সবই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দেন। তাঁর সহধর্মিণী সু'দা বিনতে আউদ (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন আমি তাঁকে বিষণ্ন অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে এত বিষণ্ন মনে হচ্ছে কেন? আমার কোনো ভুল হয়নি তো? বললেন, না; তুমি তো আমার ভালো স্ত্রী, তোমার ব্যাপারে কিছু না। আসল কথা হলো, আমার নিকট বড় অংকের মুদ্রা জমা হয়ে আছে। এখনই তা জমা হয়েছে। আমি তা নিয়ে চিন্তায় আছি কী করব? আমি বললাম; তা মানুষের মধ্যে বণ্টন করে দিন। এ কথা শোনামাত্র তিনি বাঁদীকে ডাকলেন এবং তার মাধ্যমে নিজ বংশের লোকদের মাঝে চার লক্ষ দেরহাম বণ্টন করে দিলেন। (হায়াতুস সাহাবা ২/৩৯১)

হযরত তালহা (রা.) বনু তামীম গোত্রের সব অসহায় পরিবারের দেখাশোনা করতেন। অবিবাহিতা এবং বিধবা মেয়েদের বিবাহের ব্যবস্থা করতেন। ঋণীদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করতেন। সাবীহা তায়মীর ওপর ত্রিশ হাজার দেরহাম কর্জ ছিল। সবই হযরত তালহা (রা.) নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দেন। এবং প্রতিবছর হযরত আয়েশার (রা.) নিকট দশ হাজার দেরহাম হাদিয়া হিসেবে পেশ করতেন। (সিয়ারুস সাহাবা ২/১১৫)

এ ছাড়া তিনি মেহমানদারী, মানুষের সাথে হাসিমুখে কথা বলা, যেকোনো মানুষের খেদমতসহ অনেক ভালো গুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চরিত্রে চরিত্রবান থাকার চেষ্টা করতেন।

শাহাদাত :

অবশেষে এই মহাপুরুষ ৩৬ হিজরীতে শাহাদাতবরণ করেন। উল্লেখ্য, তিনি জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর মধ্যে একজন।

বিসমিহী তা'আলা

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব (রহ.) কর্তৃক ভারতের জেলা শহর লাক্ষ্ণৌর 'হরদুঈতে' প্রতিষ্ঠিত ইলমে কিরাআতের মারকাযের অনুসরণে বাংলাদেশের ঢাকা, মোহাম্মদপুরে তাকওয়া মাদরাসায় ট্রেনিং চলছে।

হারদূঈ তরযে তা'লীমুল কুরআন ট্রেনিং

পূর্ণ ট্রেনিং কোর্সের মেয়াদ তিন মাস।

স্থান তাকওয়া মাদরাসা

বাসা নং-২২৭, রোড নং-০৭, মোহাম্মদী হাউজিং লিমিটেড,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

নিম্নবর্ণিত সময়ে প্রতিবছর চারটি ট্রেনিং কোর্স চলবে

১. ১ লা ডিসেম্বর থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।
২. ১ লা মার্চ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত।
৩. ১ লা জুন থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত।
৪. ১ লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত।

বি.দ্র. প্রতি কোর্স শুরু হওয়ার ১০ দিনের মধ্যে ভর্তি হতে হবে।

যাঁরা বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত শিখতে আগ্রহী এবং যাঁরা মুআল্লিম হতে চান উভয় প্রকার লোকই এখানে ভর্তি হতে পারেন। এই কোর্সের মাধ্যমে আপনি বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবেন এবং অন্যকে নূরানী পদ্ধতিতে বিশুদ্ধভাবে কুরআন শেখানোর যোগ্যতাও অর্জন করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

আসন সংখ্যা সীমিত। ইমাম, মুআযযিন ও আলেমদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

সার্বিক যোগাযোগ
ক্বারী মুহাম্মদ নাজিমুদ্দীন
মোবাইল : ০১৯১৩-০৪১২১৯

মুতাওয়াল্লী বোর্ডের পক্ষে
মুফতী মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী জামিয়া রহমানিয়া আরবিয়া
মোবাইল : ০১৭১২-৭৯৭১৮১

বিশ্বের ৫৫টি দেশেই এখন মাসিক আল-আবরারের পাঠক

মাসিক আল-আবরার এখন বিশ্বের ৫৫টি দেশে নিয়মিত পড়া হচ্ছে। প্রবাসী বাংলাদেশিগণ মাসিক আল-আবরারের ওয়েব ভার্সন পেয়ে খুবই পুলকিত ও আনন্দিত। আপনিও হতে পারেন অনলাইন পাঠকদের একজন।

অনলাইন পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক সময় ওয়েব ব্রাউজে সমস্যাও হয়ে থাকতে পারে। সেজন্য আমরা দুঃখিত। ওয়েবসাইটকে আরো আপডেট করা হবে ইনশাআল্লাহ। সকলের দু'আ কামনায়...

আল-আবরার পরিবার

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : সালাতুত তাসবীহ

মুহা : উমর খন্দকারী

ডুলাহাজারা, চকরিয়া।

জিজ্ঞাসা :

একজন লোক সালাতুত্তাসবীহ'র নামায আদায়কালে তন্মধ্যে যে নির্দিষ্ট তাসবীহসমূহ আছে ওই তাসবীহগুলো সশব্দে পড়ল। এখন আমার প্রশ্ন হলো, ওই ব্যক্তির নামায আদায় হবে কি না? যদি হয় তার সিজদায়ে সাহু দিতে হবে কি না? আর যদি আদায় না হয় তবে কী করতে হবে?

সমাধান :

নামাযের মধ্যে তাসবীহ নিঃশব্দে পড়া সুন্নাত। আর সুন্নাত ছেড়ে দেওয়ার কারণে সাহু সিজদাহ ওয়াজিব হয় না বিধায় সশব্দে তাসবীহ পড়ার কারণে নামায নষ্ট হয়নি। (রদ্দুল মুহতার ২/৮০,ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া ৩/২৩)

প্রসঙ্গ : ব্যবসা

মুহা : নাসিরুদ্দীন

চাষাঢ়া, নারায়ণগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

হুজুর আমি কাপড়ের ব্যবসা করি। আমি কাস্টমারের সামনে কাপড় মেপে হাতে তুলে দিই। কিন্তু মাঝে মাঝে কাস্টমার এসে অভিযোগ করে যে, সে মাপে কম পেয়েছে। যেমন আমি ১০০ কেজি কাপড় ক্রেতার সামনে মেপে তাকে বুঝিয়ে দিলাম পরবর্তীতে সে এসে বলল যে, আমি ৯৯ কেজি পেয়েছি। অথচ আমি তার সামনেই ১০০ কেজি মেপে দিয়েছিলাম। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী?

সমাধান :

আপনি যদি ক্রেতাকে পরিপূর্ণ বুঝিয়ে দিয়ে থাকেন এবং ক্রেতা পরিপূর্ণ বুঝে নেয়ার কথা স্বীকারও করে অথবা কমতি হওয়ার বিষয়টি ক্রেতার হস্তগত হওয়ার পরে সংঘটিত হয়, তবে আপনি ক্ষতি পূরণ দিতে বাধ্য নন। সর্বাবস্থায় বিক্রেতার জন্য উচিত পণ্য অন্যত্র বিক্রি করার পর পরিপূর্ণ মাপ বুঝিয়ে দেওয়া এবং ক্রেতাকে তা ভালো করে বুঝে নেয়ার তাগিদ দেওয়া। পরবর্তীতে কোনো বেশকমের জন্য বিক্রেতা দায়ী থাকবে না বলে স্পষ্ট বলে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে বেচাকেনা পরিপূর্ণ হওয়ার পর কম হওয়ার দাবি পূরণ করা বিক্রেতার জন্য জরুরি নয়। (আল-বাহরুর রায়িক্ব ৬/১০২, আদ্দুররুল মুখতার ৫/৩৬)

প্রসঙ্গ : সালিসি

মাও. মোস্তফা কামাল

ধুনট, বগুড়া।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকায় বিচারক মুরুব্বিদের একটা আইন আছে যে, বিচার যা হওয়ার পরে হবে, প্রথমে উভয় পক্ষ (অর্থাৎ বাদী-বিবাদী) কে ৫ হাজার করে টাকা জমা দিতে হবে। তবে এটা নেওয়া হয় ভীতি প্রদর্শণের জন্য–কেন তারা এরূপ মারামারী বা গণ্ডগোল করল! এখন আমার প্রশ্ন হলো, উক্ত টাকা নিয়ে তাদের খাওয়া যায়েয হবে কি না? অথবা মসজিদ-মাদরাসার কোনো কাজ তথা বাথরুম ইত্যাদি বানানো বৈধ হবে কি না?

সমাধান :

ভয় দেখানোর জন্য যে টাকা বিচারকরা নিয়ে থাকে ওই টাকা বিচারকরাও খেতে পারবে না। কোনো ফকির-মিসকিনকেও দিতে পারবে না এবং কোনো মসজিদ-মাদরাসাতেও দেওয়া যাবে না। বরং যাদের কাছ থেকে ওই টাকা নিয়েছে তাদেরকেই ফেরত দিয়ে দিতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ১২/২৫৩, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১৪/১৩৫)

প্রসঙ্গ : সমিতি

মুহা : উসমান গণী

যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমরা কয়েকজন লোক মিলে একটা সমিতি করি। উক্ত সমিতিতে প্রায় এক লক্ষ টাকা জমা হয়েছে। আমরা সবাই মিলে আমাদের মধ্য হতে একজনকে আমির নির্বাচিত করি। বর্তমানে তিনি আমাদের উক্ত সমিতির টাকা বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে থাকেন। তাই সকল সাথী মিলে আমির সাহেবের জন্য একটা বেতন নির্ধারণ করি। প্রশ্ন হলো, এভাবে আমিরের জন্য বেতন নির্ধারণ করা শরীয়তসম্মত কি না? যদি না হয় তাহলে তার পারিশ্রমিক আদায়ের কোনো হালাল পন্থা আছে কি না?

সমাধান :

কোনো শরিকদারের জন্য পারিশ্রমিক হিসাবে বেতন ধার্য্য করা জায়েয নেই। তবে, শরিকদারকে শ্রমের খাতিরে মুনাফার অংশ বেশি পরিমাণে দেয়া যেতে পারে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে আমিরের জন্য ভিন্নভাবে বেতন নির্ধারণ করা শরীয়তসম্মত হবে না। তবে, মুনাফার অংশ অন্য শরিকদের চেয়ে বেশি পরিমাণ ধার্য্য করা যেতে পারে। (আদ্দুররুল মুখতার ৬/৬০, এমদাদুল

আহকাম ৩/৩২৩)

প্রসঙ্গ : নামায

মুহা : শেরে আলী
কে আলগী, মাদারীপুর।

জিজ্ঞাসা :

(১) যে ব্যক্তি আস্তে বললে শোনে না, জোরে বললে শোনে, এমন ব্যক্তির পেছনে নামাযের ইক্তিদা করা জায়েয কি না?

(২) যে ইমাম নামাযের মধ্যে মুস্তাহাবের পাবন্দী করে না, তার পেছনে ইক্তিদা করা জায়েয কি না?

সমাধান :

বধিরকে ইমাম বানানো এবং তার পেছনে ইক্তিদা করা দোষণীয় নয়। তেমনিভাবে মুস্তাহাবের পাবন্দী করে না এমন ইমামের পেছনে নামায পড়াও বৈধ। তবে বধিরের চেয়ে শ্রবণকারী এবং সর্বদা মুস্তাহাবের পাবন্দ ইমাম শ্রেয়। (আল-বাহরুর রায়িক্ব ১/৬১১, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১৬/২৫৯)

প্রসঙ্গ : ঘুষ

মুহা : আবুবকর সিদ্দিক
৯১১ মধ্য মণিপুর, মিরপুর-২
ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমি একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স করতে চাই। ঘুষ ছাড়া লাইসেন্স করা সম্ভব হয় না।

অথবা আমি ফুটপাতে কিছু জিনিস বিক্রয় করতে চাই। এর জন্য ফুটপাতের নেতা/ পুলিশদের ৩০-৪০ টাকা করে প্রতিদিন দিতে হয় এমতাবস্থায় আমি কী করতে পারি?

সমাধান :

ঘুষ নেওয়া ও দেওয়া উভয়ই নাজায়িয। তবে অপরাগতায় দেওয়া জায়িয হলেও নেওয়া কোনো অবস্থায় বৈধ নয় বিধায় আপনার জন্য অপারগ অবস্থায় দেওয়ার অবকাশ আছে। (আল-বাহরুর রায়িক্ব ৬/৪৪১, ফাতাওয়ায়ে হাক্কানিয়া ৫/৪৮৯)

প্রসঙ্গ : জুমু'আ

মাও. মুহাম্মদ ইউনুস
তাহফিজুল কুরআন মাদরাসা
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

জুমার মসজিদ দূরে হওয়ায় ছাত্রদের যাওয়া-আসায় কষ্ট ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া ইত্যাদি কারণে ভাড়াকৃত বিল্ডিংয়ে অবস্থিত প্রাইভেট মাদরাসায় জুমু'আর নামায আদায় করা জায়েয হবে কি না? জায়েয থাকলে তার জন্য কোনো শর্ত আছে কি না?

সমাধান :

যথাসম্ভব জুমু'আর নামায জামে মসজিদে গিয়ে পড়া উত্তম। এতদ্বসত্ত্বেও যদি মসজিদ দূরে হওয়ার কারণে যাওয়া-আসা কষ্টকর ও নিরাপত্তাহীন হয় বা অন্য কোনো বিশেষ কারণে জামে মসজিদে না গিয়ে এমন কোনো স্থানে জুমু'আ আদায় করে নেওয়া হয়, যে স্থানে সর্বসাধারণের প্রবেশের অধিকার থাকে তাহলে জুমা আদায় হয়ে যাবে। বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ভাড়া বাসায় অবস্থিত প্রাইভেট মাদরাসায় জুমার নামায আদায় করা যাবে। তবে স্থায়ীভাবে তা নিয়ম বানিয়ে নেয়া উচিত নয়। (আদ্দুররুল মুখতার ৬/১৪০, কিফায়াতুল মুফতী ৩/২৩১)

প্রসঙ্গ : ব্যবসা

মুহা : নাজমুল হক
ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

(১) মালিক কর্তৃক দ্রব্যের দাম নির্ধারিত আছে। যে প্রতিনিধি মালিকের পক্ষ থেকে বিক্রেতাকে টাকা পরিশোধ করে, তাকে যদি বিক্রেতা কিছু টাকা দিয়ে যায় তবে ওই টাকা গ্রহণ করা প্রতিনিধির জন্য জায়েয হবে কি না?

(২) কোম্পানিতে চাকুরিরত প্রতিনিধি যদি কোম্পানির মালিককে বলে কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্যের দাম ২০০ টাকা হলে কিনবেন কি না? যদি মালিক কিনতে রাজি থাকে এবং দাম নির্ধারিত হওয়ার পর ২০০ টাকার কমে দ্রব্যটি কিনতে পারে, তবে বাকি টাকা প্রতিনিধির জন্য গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?

(৩) অন্যের টাকা যদি আমার কাছে থাকে এবং তার মৃত্যুবরণ বা নিখোঁজ হওয়ার কারণে টাকা ফেরত দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে দায়মুক্তির উপায় কী?

সমাধান :

(১) কোনো পণ্যের মূল্য পূর্ব থেকে নির্ধারিত কিংবা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় নির্ধারণ হওয়ার পরও বিক্রেতা যদি ক্রেতা অথবা কোম্পানির প্রতিনিধি থেকে কিছু টাকা কম নেয়, তবে সেই টাকার মালিক স্বয়ং ক্রেতা ও কোম্পানি হবে। প্রতিনিধির জন্য এ টাকা গ্রহণ করা আত্মসাৎ বলে গণ্য হবে এবং তা অবৈধ হবে। তবে মালিক বা কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে উক্ত হ্রাসকৃত মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কে অবহিত করার পর তারা স্বেচ্ছায় ফেরত না নিলে প্রতিনিধির জন্য তা গ্রহণ করা জায়েয হবে। (আল-বাহরুর রায়িক্ব ৭/২৩৭)

(২) কোম্পানির মালিক নির্দিষ্ট মূল্যে কোনো পণ্য কিনতে রাজি হওয়া সত্ত্বেও যদি প্রতিনিধি সেটি কম মূল্যে কিনতে সক্ষম হয়, সে ক্ষেত্রে মালিকের অনুমতি ছাড়া হ্রাসকৃত মূল্য গ্রহণ করা প্রতিনিধির জন্য বৈধ হবে না। (বাদায়িউস সানায়ে ৭/৪৪৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/১০২)

(৩) কারো প্রাপ্য হক কিংবা আমানত

হিসেবে রক্ষিত সম্পদ বা টাকা-পয়সা আপনার কাছে থাকলে উক্ত ব্যক্তির নিকট তা পৌঁছে দেয়া আপনার জন্য অবশ্যই জরুরি। এ ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে বা নিখোঁজ হলে তার জীবিত ওয়ারিশগণের নিকট তা হস্তান্তর করতে হবে। কোনো ওয়ারিশ জীবিত না থাকলে বা জানা না থাকলে উক্ত সম্পদ ওই ব্যক্তির পক্ষ থেকে গরিব-মিসকীনদের মাঝে সদকা করে দিতে হবে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/৩৯২)

প্রসঙ্গ : মসজিদের সম্পদ

মুহা : আব্দুল মজিদ
বরিশাল, বরগুনা।

জিজ্ঞাসা :

১. মসজিদের সম্পদ আত্মসাৎকারীর দুনিয়া ও পরকালে শাস্তি কী হবে?

২. যদি কোনো মসজিদ এক ব্যক্তির কারণে বিরান হয়। তাহলে মসজিদ বিরান হওয়ার গুনাহ উক্ত ব্যক্তির একাই বহন করতে হবে নাকি, এলাকাবাসীর সকলেরই বহন করতে হবে?

৩. কেহ জোরপূর্বক মসজিদের সম্পদ আত্মসাৎ করলে এলাকাবাসীর করণীয় কী?

সমাধান :

১. মসজিদের সম্পদ আত্মসাৎকারী কঠিন গুনাহগার হবে এবং তওবা করে মসজিদের আত্মসাৎকৃত সম্পদ ফেরত না দিলে আখিরাতে আযাবের সম্মুখীন হবে। এলাকাবাসী তাকে দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করে দেবে এবং প্রয়োজনে তার ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। (আদ্দুররুল মুখতার ৪/৩৮০)

২. কোনো বিশেষ ব্যক্তির কারণে মসজিদ বিরান হলে এলাকাবাসী তা প্রতিহত করার শক্তি রাখা সত্ত্বেও প্রতিহত না করলে সবাই গুনাহগার হবে। (ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া ৬/১০০)

৩. এলাকাবাসী তাদের শক্তি অনুযায়ী তাকে দমন করবে, সে ক্ষান্ত না হলে আইনের আশ্রয় নেবে। (এমদাদুল ফাতাওয়া ২/৬৭২)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুহা : মুজিবুল হক
পূর্ব মাইজভাণ্ডার, আমতলী,
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

বায়তুল গুফরাণ জামে মসজিদের আয়ের জন্য স্থানীয় এক ব্যক্তি ২ গণ্ডা একটি জমি মৌখিকভাবে ওয়াক্‌ফ করেন। জমিটি চাষিকে বর্গা দেওয়া হয়। মাঝেমধ্যে পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় ধান নষ্ট হয়ে যায়। তাই মসজিদ কমিটি চাচ্ছে, উক্ত জমি উচিত মূল্যে বিক্রি করে টাকাগুলো মসজিদ ফান্ডে জমা রাখবে। এমতাবস্থায় উক্ত জমি বিক্রি করা বৈধ হবে কি না?

সমাধান :

ওয়াক্‌ফকারী মৌখিক ওয়াক্‌ফ করলেও তা সহীহ হয়ে যায়। ওয়াক্‌ফ সহীহ এবং সম্পন্ন হওয়ার পর তা থেকে কোনো প্রকার উপকৃত হওয়া সম্ভব হলে বিক্রি করা জায়েয নয় বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমি বিক্রি করা জায়েয হবে না। তবে যদি ওয়াক্‌ফকারী ওয়াক্‌ফ করার সময় বিক্রি করার অনুমতি দিয়ে থাকে অথবা ওয়াক্‌ফকৃত জমি থেকে কোনোভাবেই উপকৃত হওয়া না যায় তাহলে বিক্রি করার অনুমতি আছে। এমতাবস্থায় বিক্রিত মূল্য ব্যাংক বা অন্য কোথাও জমা না রেখে মসজিদের জন্য আরেকটি জায়গা ক্রয় করে রাখবে। (রদ্দুল মুহতার ৪/৩৫২, এমদাদুল ফাতাওয়া ২/৭১৭)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুহা : রাশেদ আলম
পাংশা, রাজবাড়ী।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের মসজিদের নামে ৩ শতক জমি ওয়াক্‌ফকৃত রয়েছে। এবং তার সাথে ২ শতক সরকারি জমি রয়েছে। বর্তমানে এই ৫ শতক জমিতে পাকা মসজিদ নির্মাণ করেছি। মসজিদ করার পূর্বে সরকারি ২ শতক জমির ব্যাপারে সরকার কর্তৃক একটি প্রতিশ্রুতি কাগজ পেয়েছি। এখন স্থায়ীভাবে কাগজপত্র করার জন্য চেষ্টায় আছি। এমতাবস্থায় উক্ত মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমু'আর নামায আদায়ের শরয়ী বিধান কী? এবং স্থায়ী কাগজ পাওয়া না গেলে সেখানে নামাজ পড়ার হুকুম কী?

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিতাবস্থায় সরকারি ২ শতক জমিতে তৈরিকৃত মসজিদের ব্যাপারে সরকার অনুমোদিত কাগজ তৈরির প্রচেষ্টা চলাকালীন সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমার নামায আদায় করা সহীহ হবে, এতে কোনো অসুবিধা নেই এবং সরকার অনুমোদিত কাগজ না পাওয়ার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা না থাকলে সেখানে নামায আদায় করা সহীহ হবে এবং শরয়ী মসজিদে নামায আদায় করার ন্যায় সওয়াব হবে। তবে মসজিদের স্থায়িত্ব বাকি রাখার লক্ষ্যে সরকার অনুমোদিত কাগজ পাওয়ার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। (আল-বাহরুর রায়িক্ব ৫/৪২৮,কিফায়াতুল মুফতী ৭/৫৪)

প্রসঙ্গ : অনুদান

মুহা : হোসেন আহমদ
মণ্ডলপাড়া, সাবরাং, টেকনাফ
কক্সবাজার।

জিজ্ঞাসা : ইয়াবা ট্যাবলেট ইত্যাদি

নেশাজাত দ্রব্যের ব্যবসার টাকা থেকে মাদরাসা-মসজিদে অনুদান দেয়া হলে তা গ্রহণ করা বৈধ হবে কি না?

সমাধান :

ইয়াবা ট্যাবলেটের ব্যবসা সরকারিভাবে নিষিদ্ধ, নেশাজাত দ্রব্য বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা শরীয়তেও অবৈধ। তাই এ ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা নাজায়িয। এ ধরনের নাজায়িয অর্থ দ্বীনি কাজে ব্যবহারও নিষিদ্ধ। এরূপ টাকা গরিব-মিসকীনকে দিয়ে নিজে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা জরুরি। (রদ্দুল মুহতার ১/৬৫৮, নেজামুল ফাতাওয়া ১/২৯৯)

প্রসঙ্গ : জুমু'আর খুতবা

মুহা : ইউনুস আলী পাহলোয়ান
গাজীপুর সদর, বিআইডিসি।

জিজ্ঞাসা :

আমার এলাকার মসজিদের খতিব সাহেব জুমু'আর খুতবা প্রদানকালে আরবি খুতবা পড়ে সাথে সাথে তার বাংলা অনুবাদও করেন। তার এ কর্ম কতটুকু শরীয়তসম্মত।

সমাধান :

জুম'আর খুৎবা আরবিতে হওয়া আবশ্যক। এর সাথে অন্য কোনো ভাষার মিশ্রণ সুন্নাত পরিপন্থী হওয়ায় নিষিদ্ধ। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে খুৎবা দেওয়া শরীয়তসম্মত নয়। (ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১৬/৫১৪, রদ্দুল মুহতার ১/৪৮৩)

প্রসঙ্গ : ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা

মুহা : ওয়াহিদ হোসেন সিদ্দিকী
ম্যানেজার কি অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট
সানোফি-এভেনটিস বাংলাদেশ লিমিটেড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

বাংলাদেশি হজ্ব যাত্রীদের সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাধ্যতামূলক ভ্যাক্সিগ্রীপ ও মেনুমুন নামের দুটি ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা প্রদান করা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে উক্ত টিকা গ্রহণ বৈধ হবে কি না?

সমাধান :

ভ্যাকসিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, সানোফি পাস্তুর কর্তৃক উৎপাদিত ভ্যাক্সিগ্রীপ ও মেনুমুন নামের টিকা দুটি মুসলমান অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবহার করা বৈধ হবে। (আল আশবাহু ওয়াননাযায়ির পৃ:১৩৯, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১২/৩২৭)

প্রসঙ্গ : গানের অনুষ্ঠানে কুরআন তিলাওয়াত

মুহা : আব্দুল্লাহ আল মামুন
হাকিমপুর, হরেন্দা চৌধুরীপাড়া, কুসুম্বা পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

জিজ্ঞাসা :

(ক) নাচ, গান, খেলাধুলা, বাদ্যযন্ত্র বাজানোর অনুষ্ঠান কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু করা এবং তথাকার কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা যাবে কি না?

(খ) এ ধরনের অনুষ্ঠান সমাপ্তিকালে ইনশাআল্লাহ বলা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

(গ) একই মেমোরি কার্ডে কুরআন তিলাওয়াত এবং অশ্লীল ছবি, অডিও, ভিডিও গান লোড করা এবং তা দেখা ও শ্রবণ করার ব্যাপারে শরয়ী বিধান কী?

সমাধান :

(ক) কোনো অনুষ্ঠান কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আরম্ভ করা হয় বরকত হাসিলের জন্য। আর গান-বাদ্যের মতো হারাম কাজে বরকত হাসিল তো দূরের কথা সেই নিয়্যত করাও কুফুরী কাজ। সুতরাং নাচ-গান বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি বাজানোর অনুষ্ঠান কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আরম্ভ করা কিংবা সেই অনুষ্ঠানে কুরআন তিলাওয়াতের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা কুরআনের সাথে উপহাস করার নামান্তর বিধায় তা মারাত্মক গুনাহ।

(খ) কোনো গুনাহের কাজের ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ বলা দ্বীন নিয়ে খেল-তামাশা এবং উপহাসের শামিল। জেনে বুঝে এ ধরনের কাজ করলে ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

(গ) মেমোরি কার্ডে বা অন্য যেকোনো পন্থায় অশ্লীল ছবি, অডিও-ভিডিও গান দেখা ও শ্রবণ করা সর্বাবস্থায় হারাম। সেই সঙ্গে একই মেমোরি কার্ডে গান এবং তিলাওয়াত লোড করা কুরআনের সম্মানহানীর অন্তর্ভুক্ত তাই এ ধরনের কাজ সম্পূর্ণ না জায়েয। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৮৯, ফাতাওয়া শামিয়াহ ১/৫৪৬, ফাতাওয়া বাযযাযিয়াহ ৬/৩৩৮)

প্রসঙ্গ : মাদরাসা-বোর্ডিংয়ের টাকা

মুহা : আব্দুল্লাহ
উপজেলা সদর, কাউখালী
রাঙামাটি।

জিজ্ঞাসা :

মানুষের পক্ষ থেকে একটি হিফজ মাদরাসার বোর্ডিংয়ের জন্য দেয়া টাকা থেকে বোর্ডিং ও ছাত্রদের সকল খরচ সম্পন্ন করার পর উদ্বৃত্ত টাকা মাদরাসার মুহতামিম সাহেব কর্তৃক অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠানের গরিব ছাত্রছাত্রীকে দেওয়া জায়েয হবে কি না?

সমাধান :

মানুষের পক্ষ থেকে মাদরাসার বোর্ডিং এ প্রদত্ত টাকা মুহতামিম সাহেবের জন্য অন্য কোনো খাতে বা অন্য কোনো মাদরাসার গরিব ছাত্রদের দান করা বৈধ নয়। তবে যদি টাকা দাতাদের স্পষ্ট সম্মতি থাকে বা উক্ত টাকা মাদরাসার

বোর্ডিংয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতে কোনো প্রকার প্রয়োজন হওয়ার সম্ভবনাও না থাকে তাহলে অনুমতি আছে। (আদ্দুররুল মুখতার ৫/৫২১, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া ৬/৭৯)

প্রসঙ্গ : খতনার পর অনুষ্ঠান

সাজিদুর রহমান
মাদরাসা বাহরুল উলুম দোগাছিয়া
সদর, যশোর।

জিজ্ঞাসা :

বিভিন্ন এলাকায় দেখা যায়, সন্তানকে মুসলমানি করানোর পর অনুষ্ঠান করা হয়, সেখানে এলাকার লোকজনকে দাওয়াত দেয়া হয়। দাওয়াতি মেহমানরা অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় কিছু উপঢৌকন নিয়ে যায়। প্রশ্ন হলো, এ ধরনের অনুষ্ঠান করা বৈধ কি না?

সমাধান :

খতনার পর আনুষ্ঠানিকতার সাথে প্রচলিত দাওয়াতের অনুষ্ঠান শরীয়ত সমর্থিত নয়। (মুসনাদে আহমদ ৪/২১৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/১৫)

প্রসঙ্গ : কনুতে নাযেলা

মুহাম্মদ কমরুল ইসলাম
ফেনী।

জিজ্ঞাসা :

কুনুতে নাযেলা পড়ার সময় হাত বেধে রাখতে হবে নাকি ছেড়ে রাখবে।

উত্তর :

কুনুতে নাযেলা পড়ার সময় হাত বাধা এবং ছেড়ে দেওয়া উভয় ধরনের কথা পাওয়া যায়। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মূলনীতি অনুযায়ী হাত বাঁধা এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মূলনীতি অনুযায়ী হাত ছেড়ে দেওয়ার কথা বোঝা যায়। তাই উভয় মতের উপর আমলের অবকাশ রয়েছে। তবে হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বিশেষ কারণে হাত ছেড়ে দেওয়াকে উত্তম বলেছেন।(বাওয়াদেরুন্নাওয়াদের ৪৭৩)

مسئلہ مجتہد فیہ ہے، دلائل سے دونوں طرف گنجائش ہے اور ممکن ہے کہ ترجیح قواعد سے وضع کو ہو کما ھو مقتضی مذھب الشیخینؒ، لیکن عارض التباس وتشویش عوام کی وجہ سے ارسال کو ترجیح دی جاسکتی ہے کما ھو مذھب محمدؒ (بوادر النوادر ۴۷۳)

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও
সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

সত্ত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন-৭

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সাত অঙ্গের ওপর সিজদা করা

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قال امر النبى ﷺ ان يسجد على سبعة اعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا ، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين وفى رواية على الانف۔

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হুকুম করা হয়েছে, সাত অঙ্গের ওপর সিজদা করতে এবং চুল বস্ত্রকে না গুটাতে। (অঙ্গগুলো হলো) কপাল, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পা। অন্য এক বর্ণনায় নাকের কথা উল্লেখ রয়েছে। (সহীহে বুখারী ১/১১২, সহীহে মুসলিম ১/১৯৩)

সিজদায় তসবীহের সংখ্যা :

হযরত ইবনে মসউদ (রা.) হতে বর্ণিত–

ان النبى ﷺ قال ـــ اذا سجد فقال فى سجوده سبحان ربى الاعلى ثلث مرات فقد تم سجوده وذالك ادناه

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমরা সিজদায় سبحان ربى الاعلى তিনবার বলবে, তখন সিজদা পরিপূর্ণ হবে, এটি হলো সর্বনিম্ন সংখ্যা। (জামেয়ে তিরমিযী ১/৬০, সুনানে ইবনে মাজাহ ১/৬৩)

তাকবীর বলে সিজদা থেকে মাথা উঠানো :

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كان رسول الله ﷺ اذا قام الى الصلوة يكبر حين يقوم ـــ ثم يكبر حين يهوى ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه۔

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন, যখন সিজদার জন্য ঝুঁকতেন তখনও তাকবীর বলতেন এবং সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করার সময় তাকবীর বলতেন। (সহীহে মুসলিম ১/১৬৯)

দুই সিজদার মাঝে বসা :

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক সাহাবীকে নামাযের নিয়ম শিক্ষা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন–

ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا۔

তারপর পূর্ণস্থিতির সাথে সিজদা করো, অতঃপর সিজদা থেকে ওঠো এবং স্থিরভাবে বসো। (সহীহে বুখারী ১/১০৯, সহীহে মুসলিম ১/১৭০)

বসা অবস্থার দু'আ :

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كان رسول الله ﷺ يقول بين السجدتين فى صلوة الليل رب اغفرلى وارحمنى واجبرنى وارزقنى وارفعنى ومثله عن علىؓ

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাজ্জুদ নামাযে দু' সিজদার মাঝখানে এই দু'আ পাঠ করতেন। رب اغفرلى وارحمنى واجبرنى وارزقنى وارفعنى অর্থ হে আমর পালনকর্তা! আমার মাগফিরাত করো, আমার ওপর রহম করো, দুর্বলতা দূর করো, আমাকে রিযিক দান করো এবং উচ্চ মর্যাদাশীল করো। (সুনানে ইবনে মাজাহ ১/৬৪, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/১২৩ হাদীস নং ৩০১৪)

তাকবীর বলে দ্বিতীয় সিজদা করা :

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كان رسول الله ﷺ اذا قام الى الصلوة يكبر حين يقوم ـــ ثم يكبر حين يهوى ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد۔

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন। সিজদার জন্য ঝোকার সময় তাকবীর বলতেন, সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় তাকবীর বলতেন, এরপর সিজদা করার সময় তাকবীর বলতেন। (সহীহে মুসলিম ১/১৬৯)

উভয় হাতের মধ্যবর্তী সিজদা করা :

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

صليت خلف رسول الله ﷺ فكان اذا سجد وضع وجهه بين كفيه

আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে নামায আদায় করেছি, তিনি সিজদা করার সময় নিজের চেহরা মোবারককে উভয় হাতের মধ্যবর্তী স্থানে রাখতেন। (শরহে

মা'আনিল আসার ১/১৮২)

হাতের আঙুলগুলোকে মিলিয়ে রাখা :

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) সূত্রে বর্ণিত–

ان النبى ﷺ كان اذا سجد ضم اصابعه

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিজদারত অবস্থায় হাতের আঙুলগুলোকে মিলিয়ে রাখতেন। (সহীহে ইবনে খুযাইমা ১/৩৪৭ হাদীস নং ৬৪২, সহীহে ইবনে হিব্বান ৫৯৩ হাদীস নং ১৯২০)

হাতের আঙুলগুলোকে কিবলার দিকে রাখা :

১। হযরত হুমাইদ আস-সায়েদী (রা.) বলেন–

ان كنت احفظكم لصلاة رسول الله ﷺ رأيته اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه--- فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابعه القبلة

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামায সম্পর্কে আমি তোমাদের চেয়ে বেশি জানি। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দেখেছি... সিজদা করার সময় হাতকে জমিতে রাখতেন এবং খুব বিস্তৃতও করতেন না আবার অতি সঙ্কুচিতও করতেন না এবং আঙুলগুলো কিবলামুখী রাখতেন। (সহীহে ইবনে খুযায়মা ১/৩৪৭ হাদীস নং ৬৪৩)

২। হযরত হাফস ইবনে আসেম (রহ.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

صليت الى جنب ابن عمرؓ ففرجت بين اصابعى حين سجدت فقال يا ابن اخى اضمم اصابعك اذا سجدت واستقبل القبلة بالكفين القبلة فانهما يسجدان مع الوجه-

আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) পাশে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেছি। আমি সিজদারত অবস্থায় হাতের আঙুলগুলো খোলা রাখি। তখন হযরত উমর (রা.) বললেন, ভাতিজা! যখন সিজদা করবে তখন হাতের আঙুলগুলো মিলিয়ে কিবলামুখী রাখবে এবং হাতের তালুও কিবলার দিকে ফিরিয়ে রাখবে। কারণ চেহরার সাথে এগুলোও সিজদা করে থাকে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ২/১১২ হাদীস নং ২৯৩৮)

পায়ের গোড়ালি মিলিয়ে রাখা এবং আঙুল কিবলামুখী রাখা :

১। হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

فقدت رسول الله ﷺ وكان معى على فراشى فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا باطراف اصابعه القبلة-

আমি একদা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অথচ তিনি আমার সাথে বিছানাতেই ছিলেন। অতঃপর তাঁকে আমি সিজদারত অবস্থায় পেলাম। সিজদায় তাঁর পায়ের গোড়ালিগুলো মিলানো ছিল এবং আঙুলগুলো কিবলামুখী ছিল। (সহীহে ইবনে খুযায়মা ১/৩৫১ হাদীস নং ৬৫৪, সহীহে ইবনে হিব্বান ৫৯৫ হাদীস নং ১৯৩২)

২। হযরত হুমাইদী আসসায়েদী (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قال انا كنت احفظكم لصلوة رسول الله ﷺ رأيته اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه --- واذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামায সম্পর্কে আমি তোমাদের চেয়ে বেশি জ্ঞাত। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দেখেছি... সিজদার সময় তিনি পায়ের আঙুলগুলো কিবলামুখী রাখতেন। (সহীহে বুখারী ১/১১৪)

কনুই শরীর থেকে পৃথক রাখা :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহায়না (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

ان النبى ﷺ كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه --- وفى رواية --- ويجافى عن جنبه -

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামায আদায়ের সময় নিজের বাহুকে প্রশস্ত করতেন এমনকি বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পেত। অন্য বর্ণনায় আছে নিজের কনুই বগল থেকে পৃথক রাখতেন। (সহীহে বুখারী ১/১১২, সহীহে ইবনে খুযায়মা ১/৩৪৯ হাদীস নং ৬৪৮)

কনুইদ্বয় মাটি থেকে পৃথক রাখা :

১। হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قال رسول الله ﷺ اذاسجد فضع كفيك وارفع مرفقيك-

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমরা যখন সিজদা করবে হাতকে জমির ওপর রাখবে এবং কনুইদ্বয়কে উপরে উঠিয়ে রাখবে। (সহীহে মুসলিম ১/১৯৪)

২। হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত–

عن النبى ﷺ قال اعتدلوا فى السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমরা সিজদার মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো কেউ নিজের বাহুকে কুকুরের মতো মাটির সাথে বিছিয়ে দিও না। (সহীহে বুখারী ১/১১৩, জামেয়ে তিরমিযী ১/৬৩)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

নারী অধিকার : ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী

পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ঘটে ওই সময়, যখন মানবতা চরম বিপর্যয়ে উপনীত হয়েছিল। অত্যাচার এবং নির্যাতনে জর্জরিত মানবতার করুণ বিলাপ ছাড়া করার কিছুই ছিল না। ন্যায়নীতি ও সমতা যেন সোনার হরিণে পরিণত হয়েছিল। ইসলাম এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় সুবিচার ও ন্যায়ের স্লোগান তুলে বাস্তব ক্ষেত্রে তার হুবহু প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়। শাসক-শাসিত, মালিক-ভৃত্য এবং উঁচু-নীচুতে ভরা অশান্ত পৃথিবীকে ন্যায়নীতি, সুবিচার-ইনসাফ এবং সমতার মাধ্যমে পরিণত করেছিল একটি সুন্দর সমাজে।

আজকে সারা বিশ্ব নারী অধিকারের মুখরোচক স্লোগানে মুখরিত। আমরা যদি দেখি, ইসলাম নারীকে কী কী অধিকার দিয়েছে? প্রথমে আমাদের এ সম্পর্কে দু-তিনটি মৌলিক বিষয়ের ওপর চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন।

- মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝায়?
- অধিকারগুলো কে নির্ধারণ করবে?
- আমাদের সামাজিক জীবনে নারীরা কি তাদের প্রাপ্য অধিকারগুলো পাচ্ছে?
- যদি না পায়, তার কারণ কী? এবং এর সুষ্ঠু সমাধান কী?

অধিকারগুলো কে নির্ধারণ করবে?

১. প্রবৃত্তির দাস মানুষ?

২. সমাজ?

৩. সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ অথবা তাদের আইনপ্রণেতাগণ?

৪. ওই সত্তা, যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন?

- কোনো কৃষ্টি-কালচারের আসল ভিত্তি হবে ওই মৌলিক বিষয়ের ধ্যান-ধারণার উপর, যে ধ্যান-ধারণার ওপর ওই সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তি অন্য সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র হওয়াটাই স্বাভাবিক।
- ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সভ্যতা-সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি সব কিছুর ভিত্তিই হচ্ছে, 'রব্বানিয়্যাত [অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে]। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ তা'আলাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং আমাদের অধিপতি। মানুষ পৃথিবীতে তার প্রতিনিধি মাত্র। পৃথিবীতে তাঁরই রাজত্ব এবং কৃতিত্ব। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক আত্মা থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। [সূরা নিসা-১]

সেজন্য পুরুষ হোক বা নারী, অধিকার নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি সামনে রাখা উচিত যে, সৃষ্টিকর্তা কার দায়িত্বে কী কী জিম্মাদারি দিয়েছেন? যদি অধিকার নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে নিজ বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগাই, তাহলে পথভ্রষ্ট হওয়ারসমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

আল্লাহ নারীকে যে মৌলিক অধিকারগুলো দিয়েছেন :

- তিনি নারীকে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছেন।
- তাকে মানবতার উচ্চাসনে সমাসীন করেছেন।
- তাদেরকে ওই সব অধিকার চাওয়া ব্যতীতই দান করেছেন যার জন্য আন্দোলন করতে করতে আজ সে ক্লান্ত-শ্রান্ত।
- নারী সম্পদ অর্জন করার অধিকার চায়। ইসলাম বলে, নারী ঘরে শাহজাদী হয়ে বসে থাকবে; স্বামী তার জন্য উপার্জন করবে।
- নারী কাচের টুকরোর মতো নাজুক; সুতরাং তাকে সতর্কতার সাথে হেফাজত করতে হবে।
- ত্যাজ্য সম্পদে তার অধিকার সুনিশ্চিত করেছে।
- মাতাকে পিতার ওপর তিনগুণ সম্মান দেওয়া হয়েছে; জান্নাত মায়ের পদতলে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।
- যে ঘরে মহিলা বসবাস করে তাকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে।
- কেসাস এবং দিয়্যতে সমতা বজায় রেখেছে।
- নিজ অর্জিত সম্পদের ওপর পূর্ণ অধিকার প্রদান করেছে।
- পরকালের ছাওয়াবের ক্ষেত্রে সমতা রাখা হয়েছে।
- বিবাহ-শাদীতে তার সন্তুষ্টিকে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে।

আজকের নারীসমাজ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরিবর্তে পশ্চিমা সংস্কৃতিকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছে। সমঅধিকারের নামে পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে চায়।

সত্যি করে বলুন তো, কোন মহিলাকে স্বাধীন বলা যায়? যার স্বামী সম্পদ উপার্জন করে তার জীবিকা নির্বাহ করে, তার সব প্রয়োজন পূর্ণ করে, তাকে অনেক ভালোবাসে। সে স্বাধীন? না ওই মহিলা, যে প্রতিদিন ষোল-সতের ঘণ্টা হাড়ভাঙা খাঁটুনি খাটে। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরছে অবসাদ আর ক্লান্তিতে চুর হওয়া শরীর নিয়ে। এখন তার বিশ্রামের প্রয়োজন, আরামের প্রয়োজন। তখন তার কাজ করে দেওয়ার মতো কোনো সহযোগী নেই। তাকেই আঞ্জাম দিতে হয় সব। মৃত্যু পর্যন্ত সুখ নামক সোনার হরিণটির সাক্ষাৎ থেকে সে হচ্ছে বঞ্চিত।

এখন আপনারাই বিচার করুন, কোন

মহিলাটি স্বাধীন? যে নিজে গাধার মতো খাঁটুনি খাটে; না যে শাহজাদীর মতো বসে বসে খেতে পারে? আজকের অবুঝ নারীরা কার কাছে অধিকারের জন্য হাত পাতে? তারা কি স্বামীর তত্ত্বাবধান, পিতা-মাতার নিবিড় পরিচর্যা, ভাইদের স্নেহমাখা দৃষ্টি থেকে মুক্ত হয়ে পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে চায়? তারা কি পুলিশ বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার অধিকার, চাকুরিতে অর্ধেক কোটা সংরক্ষিত থাকার অধিকার চায়? বিবেককে একটু প্রশ্ন করুন, মডার্ন মহিলারা আজ যা চায়, তাই কি প্রকৃত স্বাধীনতা?

সত্য কথা একটু তিক্ত হলেও বাস্তবতাই আমরা বর্ণনা করব। আসলে তারা অর্ধনগ্ন হয়ে নাচ-গানের অধিকার চায়। লিভ টুগেদারের অধিকার চায়। নিজ সন্তানকে হত্যার অধিকার চায়। ধর্ষিত হওয়ার অধিকার চায়।

যখন আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রদর্শিত রাস্তা ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন শয়তানের প্ররোচণায় মানবাত্মা হাজার-হাজার অনৈতিক অধিকার দাবি করে বসে। এখন প্রশ্ন হলো,আন্দোলনের মাধ্যমে নারী কি তার অধিকারগুলো পেয়ে গেছে? না তার ওপর দিনদিন অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বাস্তব কথা হলো, তার ওপর অত্যাচারের মাত্রা দিনদিন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাকে পুরুষের দায়িত্বও আঞ্জাম দিতে হচ্ছে, আবার বাড়ির সব দায়িত্বও সম্পাদন করতে হচ্ছে। স্বামীর নিরাপদ তত্ত্বাবধান থেকে বের হয়ে তাকে অর্ধনগ্ন করে চৌরাস্তার মোড়ে বিশাল সাইনবোর্ডে প্রদর্শন করা হচ্ছে। কত জায়গায় তার সম্ভ্রমহানি হচ্ছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। মা, বোন, মেয়ে, স্ত্রীর পবিত্র স্থান থেকে সরিয়ে তাকে যৌনকর্মী হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বয়ফ্রেন্ডের কাছে তার শ্লীলতাহানি ঘটছে। অফিসের বসের মনোরঞ্জন করতে হচ্ছে। আন্দোলন হচ্ছে নারী অধিকারের জন্য; কিন্তু কারো অধিকার অর্জিত হয়েছে কি? কঠিন শীতের সময়েও নারী পূর্ণ শরীর আবৃত করে কাপড় পরিধান করতে পারে না কেন? সাইনবোর্ড এবং মিডিয়ায় সে তার অর্ধনগ্ন শরীর প্রদর্শন করছে কার স্বার্থ রক্ষায়?

মোট কথা হলো, ইসলাম নারীকে যে অধিকার ও সম্মানের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছে, অন্য কোনা ধর্ম, মতাদর্শে তার ছিঁটেফোঁটাও দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে যারা নারী অধিকারের স্লোগান তুলে তাদেরকে ঘর থেকে বের করেছে, এর ফলাফল এই হবে যে, সে হয়তো কোনো অফিসের কেরানির দায়িত্ব পালন করবে, কোনো অপরিচিত ব্যক্তির সেক্রেটারি হবে, তার দেহকে প্রদর্শন করে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো তাদের ব্যবসাকে রমরমা করবে, একটি গাড়ির বিজ্ঞাপনের সাথে তার অর্ধনগ্ন দেহের কোনো সম্পর্ক না থাকলেও তাকে অর্ধনগ্ন করে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে, এসবের ফলাফল কী? এসব অন্যায়, অনাচার, অশ্লীলতা, নোংরামিই কি 'তথাকথিত নারী স্বাধীনতার ফলাফল?

ইসলাম নারী জাতিকে সম্মানের কত উচ্চাসনে সমাসীন করেছে তার মর্যাদাকে কত সমুন্নত করেছে কুরআন-হাদীসের অসংখ্য বাণী থেকে তা অনুমান করা যায়। ইসলাম পুরো বিশ্বের সামনে নারী অধিকারের এমন বাস্তবসম্মত ফর্মুলা উপস্থাপন করেছে যার স্বীকৃতি বের হয়েছে ইসলামের শত্রু-মিত্র উভয় পক্ষ থেকেই। শেষ পর্যন্ত তারা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করলেন যে, একমাত্র ইসলামই প্রকৃত নারী অধিকারের পতাকাবাহী ও গ্যারান্টিদাতা। আজ পশ্চিমা বিশ্ব যদিও ইসলামের ওপর জোর আপত্তি তুলছে, ইসলামকে নারী অধিকারের পথে অন্তরায় মনে করছে, তা "জোর যার মুলুক তার" এই নীতির আলোকে বাস্তবতাকে ধামাচাপা দেওয়ার অপচেষ্টা মাত্র। বর্তমানেও অনেক পশ্চিমা গবেষক ও সমাজচিন্তক ইসলামকেই নারী জাতির মুক্তির একমাত্র সমাধান মনে করেন।

এখানে কয়েকজন গবেষকের কথা তুলে ধরা হলো –

'আইবলাডন" [পশ্চিমা গবেষক] লিখেন যে, মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলামই নারীর অধিকার, সম্ভ্রম ও মর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম।

"ডব্লিউ রাইট্রার" লিখেন যে, ইসলাম নারীকে যে সম্মান প্রদর্শন করেছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও অন্য মতাদর্শ তার দশ ভাগের এক ভাগও দিতে পারেনি।

"এডর মুঙ্গম" লিখেন যে, এ কথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর কালজয়ী আদর্শ শিক্ষাই "যাযাবর আরব জাতির' জীবনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছিল। মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্বে নারী ছিল ভোগবিলাসিতার পণ্য মাত্র। তাঁর অনুপম আদর্শই নারীকে খাদের কিনারা থেকে তুলে অধিষ্ঠিত করেছিল সম্মানের উচ্চাসনে। তিনি চিরতরে নিষিদ্ধ করলেন ধ্বংসাত্মক ভালোবাসা এবং লিভ টুগেদারকে। ক্রীতদাসীদের অধিকার সমুন্নত করার ক্ষেত্রে তাঁর কালজয়ী অবদান অনস্বীকার্য।

'ডব্লিউ ডব্লিউ কেশ" লিখেন যে, নারীকে মানবাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামই অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করে এবং সর্বপ্রথম তাকে 'খূলার' সুযোগ দেয়।

নারী অধিকারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক:

সাধারণত নারীকে জীবনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর অতিক্রম করতে হয়।

১.জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত।

২. দাম্পত্য জীবন

৩. স্বামীর মৃত্যু-পরবর্তী জীবন।

১. জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত :

এখানে একটি কথা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, কোনো ব্যক্তি দাম্পত্য জীবনে তখনই পদার্পণ করতে পারবে, যদি জন্মের পর তার অস্তিত্ব বহাল থাকে। কিন্তু ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে মানবজাতিকে পশুত্ব পুরোপুরি গ্রাস করে নিয়েছিল। ফলে তারা নারী জাতির সাথে দাস-দাসীদের থেকে নিকৃষ্ট আচরণ করত। তিন-চার বছরের ফুটফুটে মেয়ে সন্তানকে শুধু এ জন্য জীবন্ত কবর দেওয়া হত যে, সমাজে তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে, পরবর্তীতে সে কারো শ্বশুর হবে। কিন্তু ইসলাম কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি বাণী উচ্চারণ করেছে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো। {সূরা তাকভীর : ৮, ৯}

ইসলাম মৃতপ্রায় মানবতাকে পুনরুদ্ধার করে মেয়ে সন্তানকে জীবিত থাকার সুযোগ দান করল।

women in islam 1930- নামক গ্রন্থে ইসলাম এবং ইসলামপূর্ব যুগে মহিলাদের জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করে বলা হয়, তিনটি বিষয় রাসূল (সা.)-এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিল। ১. নামাজ ২. সুগন্ধি ৩. নারী। রাসূল (সা.) স্বীয় স্ত্রীদেরকে খুব ভালোবাসতেন। সামাজিকভাবে যখন নারীদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো তখন তিনি তাদেরকে সম্মানের সাথে জীবনযাপনের সুযোগ দিলেন। [সুন্নাতে রাসূল (সা.) ও আধুনিক বিজ্ঞান-২য় খণ্ড]

"জেনারেল গোলাপ পাশা" রাসূল (সা.)-এর পবিত্র জীবনী [the life and time of mohammad] রচনা করেন। তিনি সেখানে প্রথমে ইসলামের উত্তরাধিকার আইন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং শেষে উল্লেখ করেন যে, রাসূলই (সা.) কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করার প্রথাকে মূলোৎপাটন করেন।

"রিওয়ান্ড জি. এম. রাডুল", একজন উগ্রপন্থী খ্রিস্টান গবেষক। কিন্তু তিনি বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে না পেরে স্বীকার করলেন যে, কুরআনি শিক্ষাই অশিক্ষিত আরবজাতিকে শিক্ষিত জাতিতে পরিণত করে তোলে, সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার প্রথাকে ধ্বংস করে এবং একাধিক বিবাহকে একটি সীমিত গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত বাস্তবতা; যদিও বিরুদ্ধবাদীরা এটাকে অস্বীকার করে।

২. দাম্পত্য জীবন; জীবনের এই স্তরটাই মহিলাদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ। অনেক সময় স্ত্রী স্বামীর চাহিদা পূরণে সক্ষম হয় না। বিধায় স্বামী তার কাম চরিতার্থ করার জন্য বাজারের বেশ্যা নারীদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। আর এ কারণেই নেমে আসে হতাশা, নিরাশা, ভাঙে ঘর, বাড়ে অশান্তি। ইসলাম এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য একাধিক বিবাহের ব্যবস্থা রেখেছে। ইসলামের বিধানাবলি নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করে যারা আলোচনায় আসেন, ইসলামের ওপর তাদের একটি বড় আপত্তি এই যে, ইসলামে একাধিক বিয়ের মাধ্যমে নারীকে ভোগ-বিলাসিতার পণ্যে পরিণত করা হয়েছে এবং সতিনের জ্বালায় তাকে মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিকভাবে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

প্রগতিবাদীদের এই আপত্তি কতটুকু বাস্তবসম্মত? একাধিক বিবাহে কী কী কল্যাণ নিহিত আছে? একাধিক বিয়ে কি প্রকৃতিগত বিষয়, না প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক? এইসব প্রশ্নের যৌক্তিক উত্তর আলেমদের পক্ষ থেকে অনেক পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ের ওপর অনেক স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচিত হয়েছে। আমরা বিস্তারিত উত্তরের দিকে যাব না; কিন্তু যে কথাটি না বললেই নয়, তা হচ্ছে, ইসলাম একাধিক বিবাহের প্রবর্তক নয়। বরং ইসলামের অনেক পূর্ব থেকেই ওই প্রথাটি চালু রয়েছে। উপরন্তু ইসলাম সংখ্যাধিক্যের সীমিতকরণে প্রথম উদ্যোগী এবং স্ত্রী অধিকার নিশ্চিতকরণের নীতিমালা প্রণয়নের প্রথম প্রবর্তক। বর্তমান যুগেও একাধিক বিয়ের প্রচলন রয়েছে। ব্যবধান শুধু এতটুকুই যে, ইসলাম ধর্মে আইনকানুনের দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক বিয়ের বৈধতা দেওয়া হয়েছে, অন্যান্য ধর্মে চতুস্পদ জন্তুর মতো।

এখন বিবেককেই প্রশ্ন করুন, কোনো পুরুষ একাধিক বিয়ে করে তার স্ত্রী-সন্তান-সন্ততির তদারকি করে এবং পার্থিব ও পারলৌকিক ব্যাপারে সচেতন থাকে, নারীর জন্য এ রীতি শ্রেয়? না কোনো পুরুষ তাকে ভোগ-লালসায় মেতে উঠে, তার সম্ভ্রমকে ভূলুণ্ঠিত করে, অবশেষে পুরুষটি তাকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে নতুন মুখের সন্ধানে আরেক বাগানে প্রস্থান করে, তা উত্তম?

একজন গবেষক লিখেছেন যে, পশ্চিমাবিশ্বে প্রকাশ্যে যদিও একাধিক বিয়ে অনুমোদিত নয়; কিন্তু বাস্তবে সেখানেও একাধিক বিয়ে রয়েছে। আর তা হলো চতুস্পদ জানোয়ারের ন্যায়। যখন কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে ভোগ করার পর তার প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন তাকে ব্যবহৃত টিস্যুর মতো নিক্ষেপ করে দেয় এবং ওই মহিলাটি বেশ্যা নারীতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে ওই মহিলাটি অনাহারে-অর্ধাহারে মানবেতর জীবন যাপন করে। অতএব নারীর জন্য কোনটি উত্তম? বিয়ে না পতিতা বৃত্তি? পরবর্তীতে ওই নারীদের অবস্থা কী হয়, তা একটি ঘটনা থেকেই অনুমান করা

যায়। আল্লামা তাকী উসমানী ম.জি. তাঁর 'জাহানে দীদাহ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি আমেরিকা সফরকালীন একটি বাসের গায়ে একটি বিজ্ঞাপন দেখতে পান। বিজ্ঞাপনে কিছু মহিলার নাম, ঠিকানা লেখা ছিল, যাতে লেখা ছিল, "পে উইথ আওয়ার বডিজ"- আমাদের শরীর ভোগ কর। এরই নাম কি নারী অধিকার, এরই নাম কি নারী স্বাধীনতা?

"ওয়াল্ট্রার", একজন ফ্রান্সিস ঐতিহাসিক। ইসলামের সভ্যতার ওপর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেন যে, মুসলমানদের ওপর যারা এই অভিযোগ তোলে, মুসলমানরা বিলাসিতাপ্রিয়; আমি মনে করি, তারা গণ্ডমূর্খ।এ অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মনগড়া।

'তমদ্দুনুল আরব' প্রণেতা "ড. মুস্তাওলিবান" লিখেন যে, মুসলমানদের বৈধ একাধিক বিয়ে পশ্চিমাদের অবৈধ একাধিক বিয়ে হতে হাজার গুণে উত্তম। এ কথাটি নির্দ্বিধায় বলা যায়, পশ্চিমাবিশ্বে একটা পুতঃপবিত্র নারী পাওয়টাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩. স্বামীর মৃত্যুর পর :

ইসলামপূর্ব যুগে নারীরা বিবাহের পূর্বে পিতার দায়িত্বে এবং বিবাহের পর স্বামীর দায়িত্বে থাকত। পিতার সম্পদ থেকে সে সম্পদের কোনো অংশ পেত না। কয়েক বছর পূর্বেও ভারতবর্ষে মহিলাদের মাঝে এই একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যেত যে, বিয়ের সময় যৌতুক হিসেবে যা নেওয়া সম্ভব তাই ওরা নিয়ে যেত। তেমনিভাবে স্বামীর পূর্বে স্ত্রী মারা গেলে স্বামীর সম্পদে তার কোনো অধিকার থাকত না। বরং অন্যরা সব সম্পদের অধিকারী হয়ে যেত। কিন্তু ইসলাম এই অমানবিক কুপ্রথাকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করে দ্ব্যার্থহীনকণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, স্বামী যদি স্ত্রীর পূর্বে মারা যায়, তবে স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর অবশ্যই অধিকার রয়েছে।

ইসলামের এই সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে ফ্রান্সিস গবেষক "ড. গুস্তাওলী" অকপটে স্বীকার করেছেন যে, ইসলাম নারীদের অধিকার সুসংহত করার ক্ষেত্রে ত্যাজ্য সম্পদে তাদের যে নির্দিষ্ট অংশের কথা ঘোষণা করেছে তা পশ্চিমাদের "তথাকথিত নারী" অধিকারের তুলনায় অনেক বেশী কার্যকর ও ফলপ্রসূ। [সুন্নাতে রাসূল (সা.) ও আধুনিক বিজ্ঞান]

"প্রফেসর ড. এস. মার্জিলিউট"; একজন পশ্চিমা লেখক। তার ইসলামবিদ্বেষ সর্বজনবিদিত। ইসলাম সম্পর্কে সে অনেক আপত্তিকর মন্তব্য করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও হৃদয়ের আহবানকে সে উপেক্ষা করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত সে খ্রিস্টান ধর্ম ও ইহুদি ধর্মে নারীর অধিকার সম্পর্কে সমালোচনার ঝড় তোলে। সে বলতে বাধ্য হয় যে, ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মে এ কথা কল্পনাও করা যায় না যে, নারীও সম্মান ও সম্পদের অধিকারী হবে। পুরুষের মতো তাকেও সমাজে মূল্যায়ন করা হবে। বরং তার সাথে আচরণ করা হয় দাস-দাসীর মতো। ইসলামই নারীকে তার প্রকৃত স্বাধীনতার অপূর্ব স্বাদ আস্বাদন করিয়েছে এবং তাকে অত্যাচার ও নির্যাতনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছে।

দিল্লি হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস "মাস্টার রাজন্দর" একটি সেমিনারে বলেছিলেন, ইতিহাস এ কথার স্বাক্ষী দেয় যে, নারীদেরকে সম্পদের অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামই অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেছে। এটাই বাস্তবতা যে, হিন্দুস্থানে "হিন্দু কোর্ট বিল" প্রণীত হওয়ার পূর্বে নারীরা সম্পদের কোনো অংশই লাভ করত না। অথচ ইসলাম নারীদেরকে এই অধিকারটি "চৌদ্দশত" বছর পূর্বেই প্রদান করেছে।

শেষ কথা : নারী যেহেতু ঘরের ভূষণ। সে ভূষণকে কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য ইসলাম কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এই নীতিমালা নারী অগ্রগতির পথে অন্তরায় নয়। তেমনিভাবে এই নীতিমালা তাকে কোণঠাসা করার জন্যও নয়। বরং এগুলো নারীর ইজ্জত-সম্মান, আব্রু-মর্যাদার মুহাফিজ। তাদের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। তাদের প্রতি স্রষ্টার চরম করুণার নিদর্শন।

এই কথাটি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন প্রখ্যাত দার্শনিক "হ্যামিল্টন"। তিনি বলেন, নারী সম্পর্কে ইসলামের বিধান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ইসলাম চায়না, নারী কলঙ্কিত হউক, তাই সে কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, যাতে নারী সম্মানজনকভাবে জীবন যাপন করতে পারে।

"সার্জান ব্যাগ" লিখেন যে, মুহাম্মদ (সা.) নারীর ওপর কোনো কঠোর বিধিমালা আরোপ করেননি; বরং ওই বিধিমালার মধ্যেই নিহিত রয়েছে নারীর স্বাভাবিক জীবনযাপনের গ্যারান্টি।

অমুসলিমরা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করায় তনু-মনে অনিচ্ছাকৃতভাবে নিম্মোক্ত আয়াতটি গুঞ্জরিত হতে থাকে

[আয়াত] অর্থ; আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। [সূরা আলে-ইমরান-১৯]

আর কুরআনের নিম্মোক্ত আয়াতটির সত্যতাও সামনে আসে,

[আয়াত] অর্থ; নিশ্চয়ই কুরআন সঠিক পথের দিকেই পথপ্রদর্শন করে। [সূরা বনী ইসরাইল-৯]

আহ! কতই না ভালো হতো, যদি তারা হক্বকে [সত্যকে] স্বীকার করার সাথে-সাথে হক্বকে [ইসলাম] গ্রহণও করতেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

উদীয়মান কাফেলা

পর্দার বিধান ও সুন্নাতের উপর আমল করায় এক মার্কিন মহিলা ডাক্তারের ইসলাম গ্রহণ

সম্প্রতি মার্কিন শিশু ও নারী বিশেষজ্ঞ ডা. ইউ এস অরি ভিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। নিজের ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে ডা. অরভিয়া বলেন, আমি আমেরিকার একটি হাসপাতালে নারী ও শিশু বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করি। একদিন হাসপাতালে এক আরব মুসলিম নারী এলেন বাচ্চা প্রসবের জন্য। প্রসবের পূর্বমুহূর্তে তিনি ব্যথায় কাতরাচ্ছিলেন। প্রসব মুহূর্ত ঘনিয়ে এলে তাকে জানালাম আমি বাসায় যাচ্ছি। আর আপনার বাচ্চা প্রসবের দায়িত্ব অর্পণ করে যাচ্ছি অন্য একজন ডাক্তারের হাতে। মহিলা হঠাৎ কাঁদতে লাগলেন এবং সাথে সাথে জুড়ে দিলেন, না না আমি কোনো পুরুষ ডাক্তারের সাহায্য চাই না। আমি তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। এ অবস্থায় তার স্বামী আমাকে জানালেন। সে চাইতেছে তার কাছে যেন কোনো পুরুষের আগমন না ঘটে। কারণ সে সাবালক হওয়া থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত তার আপন বাপ, ভাই ও মামা প্রভৃতি মাহরাম পুরুষ ছাড়া অন্য কেউ তার চেহারা দেখেনি। আমি হেসে উঠলাম। তারপর চরম বিস্ময় হয়ে তাকে বললাম, অথচ আমি এমন এক নারী আমেরিকান হেন কোনো পুরুষ নেই, যারা আমার চেহারা দেখিনি। অতঃপর আমি তার আবেদনে সাড়া দিলাম। বাচ্চা প্রসবের পরদিন আমি তাকে সাহস ও সান্ত্বনা দিতে এলাম। পাশে বসে তাকে জানালাম, প্রসব উত্তর সময়ে দাম্পত্যমিলন অব্যাহত রাখার দরুন আমেরিকার অনেক মহিলা অভ্যন্তরীণসংক্রান্ত এবং সন্তান প্রসবঘটিত জ্বরে ভোগেন।

অতএব আপনি এ সম্পর্ক স্থাপন থেকে কম পক্ষে ৪০ দিন বিরত রাখবেন। এ ৪০ দিন পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ ও শারীরিক পরিশ্রম থেকে দূরে থাকার গুরুত্ব ও তুলে ধরলাম তার সামনে। এটা করলাম আমি সর্বশেষ ডাক্তারি গবেষণার ফলাফলের নিরিখে।

অথচ আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে তিনি জানালেন, ইসলাম এ কথা বলে দিয়েছে। প্রসব-উত্তর ৪০ দিন পবিত্র হওয়া অবধি ইসলাম স্ত্রী মিলন নিষিদ্ধ করেছে। এ কথা শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। বিস্ময়ে বিমূঢ় হলাম। তাহলে আমাদের এত গবেষণা আর এত পরিশ্রমের পর কেবল আমরা ইসলামের শিক্ষা পর্যন্ত পৌঁছলাম।

আরেক দিন এক শিশু বিশেষজ্ঞ এলেন নবজাতককে দেখতে। তিনি শিশুর মায়ের উদ্দেশ্যে বললেন, বাচ্চাকে যদি ডান কাতে শোয়ান তবে তা শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। এতে করে তার হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক থাকে। শিশুর বাবা তখন বলে উঠলেন। আমরা সবাই সর্বদাই ডান পাশ হয়ে ঘুমাই। এটা আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত। এ কথা শুনে আমি বিস্ময়ে থ হয়ে গেলাম! এই জ্ঞান লাভ করতে আমাদের জীবনটাই পার করলাম আর সে কি না তার ধর্ম থেকেই এ শিক্ষা পেয়েছে। ফলে আমি এ ধর্ম সম্পর্কে জানার সিদ্ধান্ত নিলাম। ইসলাম সম্পর্কে পড়া শোনার জন্য আমি এক মাসের ছুটি নিলাম এবং আমেরিকার অন্য শহরে চলে গেলাম, যেখানে একটি ইসলামিক সেন্টার আছে। সেখানে আমি অধিকাংশ সময় নানা জিজ্ঞাসা আর প্রশ্নোত্তরের মধ্যে সময় কাটালাম। আরব ও আমেরিকার মুসলামানের সঙ্গে উঠা-বসা করলাম। আলহামদুলিল্লাহ! এর কয়েক মাসের মাথায় আমি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলাম।

এ ঘটনা থেকে শিক্ষা :

আমরা সব মুসলমান, ইসলামের পথে আসি। এবং আল্লাহর হুকুমকে সঠিকভাবে মেনে চলি। আর সাথে নবীর আদর্শকে জীবনের বাস্তবায়ন করি। যদি আমরা আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে পারি। আর সাথে সাথে নবীর আদর্শ নিজেরদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি। তাহলে হাজার হাজার অমুসলমান আমাদের আদর্শ দেখে ইসলামের পতাকার ছায়া তলে আসতে থাকবে। যার দ্বারা ইসলামের শক্তি বাড়বে। এবং পরস্পরের মধ্যে হিংসা, জুলুম, অত্যাচার কোনো কিছু থাকবে না। বরং সবাই শান্তিতে বসবাস করতে পারব।

সূত্র : দৈনিক আমার দেশ, ইন্টারনেট।

মুহাঃ নাজমুল হক বগুড়াবী

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156

ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent

হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
"আল-আবরার" এই কামনায়

জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান

প্রস্তুতকারক

হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ
চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩